:: দ্বিতীয় অধ্যায় ::

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

(বলাকা থেকে পরিশেষ)

(ক) জাতীয় আন্তর্জাতিক পটভূমি ও কাব্যবিচার -

কাব্যগ্রন্থের আকারে বলাকার প্রকাশকাল ১৯১৬ হলেও বলাকার কবিতা রচনার পালা সুরু হয় ১৯১৪ থেকে । আর পরিশেষের শেষ কবিতা লেখা হয় ১৯৩২-এ । এ-দুয়ের মাঝখানকার কালগত ব্যবধান আঠারো বছরের । আলোচ্য পর্বের বিস্তারও এই আঠারো বছরের । এই সময়ের মধ্যে 'বলাকা'র পর একে একে লেখা হ'য়েছে পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৩২৯), লেখন (১৯২৭) মহুয়া (১৯২৯, বনবাণী (১৯৩১) ও পরিশেষ (১৯৩২) — এই কাব্যগুলির অন্তর্গত কবিতা নিয়ে ।

আলোচ্য কালপর্ব রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য উভয়দিক থেকেই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ । নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং সেইসূত্রে তাঁর কবি প্রতিভার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে অব্যবহিতপূর্বে । এখন তিনি কেবল আর বাংলার বা ভারতের কবি নন — এখন তিনি বিশ্বকবি । তাঁর কবিতাও নতুন প্রেরণায় নতুন আবেগে নতুন দিগন্ত স্পর্শে উন্মুখর । বিশ্বকবিকে বিশ্বপথিকের ভূমিকায় দেখা যাবে এই পর্বে । বারবোর তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বিচিত্র আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বপরিক্রমণে । ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে তারিখে তৃতীয়বার বিদেশ যাত্রায় বেরিয়ে লণ্ডনে মি. এন্ড্রুজ সহ ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হ'য়েছে । ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-নাথের বিদেশযাত্রায় ইংলণ্ডই ছিল একমাত্র স্থান । এই পর্বে তাঁকে বারবোর বিদেশ-যাত্রী হতে দেখা যাবে এবং তাঁর ভ্রমণ ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে শুধু ইংলণ্ডে নয় , প্রায় সমস্ত পৃথিবী । প্রতিবেশী সিংহল, পুরনো আত্মীয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, প্রাচীন চীন, নবীন জাপান, বিত্তবান আমেরিকা — উত্তর ও দক্ষিণ, কানাডা, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশসহ সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়ন এই পর্বে তাঁর ভ্রমণসূচীর

অন্তর্গত ।[1] ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সেই ইংলণ্ড সফরের পর শেষবার তিনি ইংলণ্ডে যান ১৯৩০ - এ । ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে ইংলণ্ডের ওপর দিয়ে । আর একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন ইউরোপ ও ইংলণ্ড । মাঝখানে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে অর্থনীতিতে ওখানকার মানুষের মানসিকতায় গভীর পরিবর্তনের স্পর্শ লেগেছে । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সুধী সমাজের নিকট থেকে যে আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছিলেন তিনি ১৯২০ - ২১ - এর ইংলণ্ড ও ইউরোপ সফরে, সেই সব ক্ষেত্র থেকে পাওয়া নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা কবির সূক্ষ্ম সংবেদনশীল চেতনায় গভীর ভাবে ধরা দিয়েছে । মাঝখানে শাসক ইংলণ্ড ও শাসিত ভারতবাসীর সম্পর্কের অবনতি — শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এবং শাসিতের প্রতি তাঁর সহানুভূতিই যে এর অন্যতম কারণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের এই স্বরূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে । পশ্চিমের জীবনাবেগ, কর্মচঞ্চলতা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগের ফলে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়াস তিনি দেখেছেন । চিন্তানায়ক মনীষীবৃন্দের মধ্যে মানব-মুক্তির উদার প্রয়াস লক্ষ্য করে উৎসাহিত বোধ করেছেন । আবার অন্যদিকে দেখেছেন তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তার মোহান্ধতা, ধনসঞ্চয়ের আগ্রাসী ক্ষুধা, বিজ্ঞানশক্তির অপপ্রয়োগ, জীবনের অসুস্থতা আর সেই সর্ব আত্মঘাতী যুদ্ধের উন্মাদনা । বিশ্ব-পরিক্রমার সূত্রে লব্ধ সুখে - দুঃখে মেলানো এই বিচিত্র মানবজীবন অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে স্বভাবতঃই তাঁর রচনায় । জীবন জিজ্ঞাসার পরিধি - বিস্তার ঘটেছে তার ফলে অনিবার্যভাবে তাঁর কবিতায় নতুনমাত্রা সংযোজিত হ'য়েছে ।

রবীন্দ্র কবিতার পাঠক-ও তার এই পর্বে শুধুমাত্র বঙ্গভাষাভাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি । লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে ইয়েটস্‌-এর ভূমিকা সম্বলিত গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের (নভেম্বর, ১৯১২) পর ওই একই সময়ে

* *

১। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

শিকাগোর 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় হ্যারিয়েট মনরো কর্তৃক গীতাঞ্জলির ছটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় রবীন্দ্র সাহিত্যের আদি পরিচয় ঘটে এই সূত্রে। অতঃপর ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক গীতাঞ্জলির সুলভ সংস্করণ, 'গার্ডেনার' 'ক্রিসেন্টমুন' প্রকাশিত (১৯১৩) হয়। ইন্ডিয়া সোসাইটি তাঁর গল্পের অনুবাদ 'গ্লিম্পসেস্ অফ বেঙ্গল' প্রকাশ করে। অতঃপর পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্বজোড়া তাঁর পাঠক সমাজের বিস্তার ঘটে। বিশ্বব্যাপী পাঠক সমাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে অতঃপর তাঁর সাহিত্য সাধনার পালা চলতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা বিশ্বজীবনস্পর্শ লাভ করলো বটে কিন্তু স্বদেশ স্বভূমি অর্থাৎ বঙ্গদেশ বা ভারত ভূমি থেকে তিনি নিজেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করে নেন নি। এই পর্বেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রায় সর্বত্র – পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে গুজরাট আর উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বারবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। ভারতীয় সাধনার ঐক্য সর্বভূতের কল্যাণসাধন চিন্তাকে উপলব্ধি করেছেন, আবার সেই সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের ভেতরকার দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারের বন্ধন, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা আর তাদের ওপরে পরদেশী শাসন ও শোষণের স্বরূপ ও লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন প্রয়াসের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে কখনো কখনো এইসব প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকেও যুক্ত করেছেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই পর্বে তাঁর অবস্থানক্ষেত্র প্রধানতঃ শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন আর সাময়িকভাবে কলকাতা। উত্তরবঙ্গের জমিদারীতে শ্রী নিকেতনে পল্লী সংগঠনকর্মের সক্রিয় পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত থেকেছেন * আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করেছেন বিশ্বভারতীতে – 'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকম্ নীড়ম্'। এই সব ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাত তাঁর কাব্যপ্রয়াসে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধ্যানকল্পনার অন্তিম যে লক্ষ্য – মানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও পরিপূর্ণতা সেই লক্ষ্যাভিসারী তাঁর প্রতিভা [illegible] মানবসংসারের সর্বত্র ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেছে এবং যেখানেই মানবাত্মার পীড়ন এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা তা তাঁর মর্মের গভীরে তীব্রভাবে বেজেছে এবং তাঁর কাব্যে তা অনুরণিত হয়েছে । এই সব সূত্র ধরে আলোচ্যপর্বের রবীন্দ্র কবিতায় সমাজ সম্পর্কের ধারা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গ্রহণ করা বিধেয় । দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ ও তার সঙ্গে রবীন্দ্র কবিতার সম্পর্কসূত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এই দুই ধারারই অন্তর্গত ঘটনা প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে । সমকালীন এই ঘটনাপুঞ্জের এই XX দুই রকমের প্রভাবই রবীন্দ্রকবিতায় অনুভব করা যায় । আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত কবিতার পেছনে কাজ করেছে কখনো একই সঙ্গে আবার কখনো-বা দুটো আলাদাভাবেও । ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে যে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটলো তার প্রস্তুতি পর্ব চলছিলো কয়েক বছর ধরেই । জার্মানী হ'য়ে উঠলো সাম্রাজ্যবাদী । ফলে গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রমাদ গুনলো । জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলো ১ আগস্ট ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে । অস্ট্রিয়া জার্মানীর পক্ষ নিয়ে রাশিয়া, ফ্রান্স, সার্বিয়া আক্রমণ করলো ২ আগস্ট । ইংলণ্ড ৪ আগস্ট যুদ্ধে যোগ দিলো । মহাযুদ্ধও ঘোষিত হ'লো – ৪ আগস্ট , ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে । রাশিয়া , জাপান , ইতালি , ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সম্মিলিত হ'য়ে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হ'লো । অন্যপক্ষে জার্মানী আক্রমণ করলো ফ্রান্স আর সেই উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামের পথে এগোতে থাকলো । বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ব্যাহত হ'লো । বেলজিয়ামের মাটিতে উভয় জোটের যে লড়াই হ'লো তাতে প্রচুর হতাহত হ'লো । রাশিয়ান সৈন্য জার্মান সৈন্যের কাছে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো । তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দিলো যুদ্ধ শুরু হবার পরে – অক্টোবরের শেষ দিকে । ভারতীয় সৈন্যকে মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইনে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠালেন ভারত সরকার । যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে থাকলো । আটলান্টিক মহাসাগরের বুকেও জার্মানী ও ব্রিটিশের সরাসরি যুদ্ধ হ'লো ।

এই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। ভারত ও এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া থেকে বাদ যায় নি, কেননা ব্রিটিশ তখন ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আর ব্রিটিশ ছিল এই মহাযুদ্ধের আসরে এক বড়ো শক্তি। মহাযুদ্ধ শুরু হ'লো, তখন থেকে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কী করে রক্ষা পাবে সেই চিন্তাতেই মতোটা মগ্ন থেকেছেন দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে ততোটা মাথা ঘামাননি। আর ইংরেজ সরকারও সুযোগ বুঝে অন্যায়ভাবে জোর করে দেশের অন্যান্য ■ অংশ বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে সৈন্য পাঠালেন যুদ্ধ করবার জন্য। ফলে ইংরেজের প্রতি ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ হ'লো বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলায় সন্ত্রাসবাদ প্রবল হ'লো। অন্যদিকে 'ভারত রক্ষা' আইনের বলে বিশেষ বিচার কমিটি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৩৮ জনের ফাঁসি, ৫৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও আরো অনেকের জন্য সাময়িক দ্বীপান্তর বা সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দেয়। এ ছাড়া কারাগারে যে সমস্ত ভারতীয় বন্দীরা ছিল তাদের উপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলতে থাকে ভারতরক্ষা আইনের বলেই — অথবা বিনা আইনেই। গান্ধীজী কিন্তু এই পর্বে ভারতের মাটিতে অত্যাচারিত ভারতীয়দের কথা ভাবেন নি — বরং তিনি আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের কথাই ভাবছিলেন, আর সেই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগও রেখেছিলেন। ন্যায় - নীতি ও মানবিক ধর্মবোধের উপরে স্থাপিত সংগ্রামের পথ বেছে নেবার ক্ষেত্রে গান্ধীজীও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনোই কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেন নি। যুদ্ধ এবং তার ফলাফল দেখে, যুদ্ধোন্মাদ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অত্যাচারীরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথও হ'য়ে উঠলেন আতঙ্কিত। এই যুদ্ধের সূচনায় যুদ্ধ সম্পর্কে অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক মহাশয়ের যুদ্ধ সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের পৃষ্ঠাতেই 'লড়াইয়ের মূল' [২] প্রবন্ধটি লিখলেন। এতে বললেন, —

* *

২। লড়াইয়ের মূল — (পৌষ, ১৩২১) রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২২৯ - ২৩১ ।

"সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্যজীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে — বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্মানি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারী একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে। আজ প্রুশিয় জর্মানির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে — যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে। য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।"
'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত হয়। রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ঘটনা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হ'লেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী দেশীয় কী আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর গভীর সচেতন দৃষ্টি দিয়ে তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ — এই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরীন যে স্বদেশী আন্দোলন তাতে প্রধানভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসের নরমপন্থী, চরমপন্থী দুটি বিভাগ ও সন্ত্রাসবাদীর দল। কংগ্রেসের এই নরমপন্থীরা স্বায়ত্ত-শাসন চাইলেন সরকারের কাছে অনুনয় বিনয়ের মধ্য দিয়ে, কংগ্রেসের চরমপন্থীরা স্বরাজ চাইলেন প্রতিরোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আর সন্ত্রাসবাদীরা গেলেন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথে বোমা আর গুলির শব্দ নিয়ে। মোট কথা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির একই আকাঙ্খা — স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। আর মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের তথা বৃটেনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ মহাযুদ্ধের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যুদ্ধের কালো হাওয়া যখন সূচনার দিন গুণছে সেই সময়ে ইংরেজশাসিত ভারতেও জ্বলছে প্রতিদিন অশান্তির আগুন। সন্ত্রাসবাদের শিকড় তখন অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। সেদিন ছিল দিল্লীকে ভারতের রাজধানীরূপে ঘোষণা করবার দিন। সেই দিনই দিল্লীর চাঁদনীচকের কাছে বড়লাট হার্ডিঞ্জ আক্রান্ত হলেন ভারতীয়দের হাতেই। কিন্তু আবার সেই হার্ডিঞ্জকেই তাঁর শাসননীতি কার্যকরী করে তুলবার

কাছে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন গোখেল নরমপন্থী কংগ্রেসীদের অন্যতম নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থেকে। অন্যায়কারীদের উপরে শাস্তির বিধান কিন্তু পূর্বাপেক্ষাও কঠোর হলো ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নতুন আইনে । ফলে এই বছরেই হার্ডিঞ্জ - এর হত্যাকারীদের উপরে কঠোর শাস্তি বলবৎ হ'লো ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর বুড়ী বালামের তীরে কয়েকজন বিপ্লবী বাঙালীর বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ - যুদ্ধ একটি বিশিষ্ট ঘটনা হ'য়ে আছে । যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সঙ্গে তদানীন্তন জার্মান সরকারের যোগ ছিল । জার্মানীতে সংগঠিত (১৯১৪) ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটির মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করেছিলেন । আবার ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পাসপোর্ট নিয়ে P. N. Tagore ছদ্মনামে জাপানের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করলেন সেটিও আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'ও 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখা দিলো ছাত্র অসন্তোষ ও সরকারের বিরুদ্ধে পালটা দমননীতি । ভারতীয়দের সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্য করলে ঐ কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন - ও ছাত্রদের দ্বারা অপমানিত হলেন । ঐ কলেজেরই ছাত্র তখন সুভাষচন্দ্র । তিনি ছাত্রদের পক্ষে নেতৃত্ব দিলেন । রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' [৩] প্রবন্ধে এই দমননীতির প্রতিবাদ ও কৌশলে ছাত্রদের অর্থাৎ দেশের যুব সমাজের নির্ভীক স্বদেশপ্রেমকেই অভিনন্দিত করে বললেন, "বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না । লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া

****

৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র — (সবুজপত্র, ১৩২২, চৈত্র) রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৪৮ - ৫১ ।

পড়ে । তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয় । যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম । তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন ।

আমরা কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না । তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয় । যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই, যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব ।"

বলাকা কাব্য রচনা শেষ করে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ মে তাঁর জন্মদিনে 'বলাকা' উৎসর্গ করেন বিদেশী বন্ধু পিয়ার্সনকে । চীন - জাপান যুদ্ধে ইতিমধ্যে জাপান কর্তৃক চীন পরাজিত ও অপমানিত হয় । ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জাপান ভ্রমণের সময় জাপানে প্রদত্ত কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দি ন্যাশন', 'দি স্পিরিট অব্ জাপান' ইত্যাদি । জাপান সরকারের অসন্তোষ সত্ত্বেও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কবিকর্তৃক ধিক্কৃত হয় । [৪] আমেরিকা গিয়ে 'সানসেট্ ক্লাবে' কবি যে ভাষণ দেন (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) তার বিষয় ছিল 'দি কাল্ট অব্ ন্যাশনালিজম্' ।

****

৪। রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণে জাপানের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে 'এশিয়ান আইডিয়াস অব ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থের লেখক স্টিফেন এন. হে বলেছেন —
'Japan and the Japanese lapsed into a significant silence after the Indian poet delivered his Tokyo University lecture, and did not resume its commentary on him until he had sailed for the United States. Then it passed a stern judgment on his visit : "Frnakly speaking, his philosophical ideas and their influence during his three months' stay in Japan, have been, we regret to say, very weak. This is disappointing both to our country men and to him" - Asian Ideas of East and West, Tagore and his critics in Japan, China and India, Stephen N. Hay, Harvard University Press, 1970, P - 116.

কয়েকদিনের ব্যবধানে (১৮ নভেম্বর), নুইয়র্কে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ন্যাশনালিজম্' । সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কীভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশার ফাঁদে দেশের মানুষকে বন্দী করে তুলছিলো , জাতীয়তার দোহাই পেড়ে কীভাবে দুর্বল দেশগুলির ওপরে তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস চালাচ্ছিলো তা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় সহজেই ধরা পড়েছিলো । সংকীর্ণ এই জাতীয়তাবাদ পরিণামে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের সূচনা করবে এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ হ'লো সভ্যতার শত্রু ।' [৫] স্বদেশে যখন দেশপ্রেম ও জাতীয়তার চেতনা - প্রসারের প্রয়াস চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ন্যাশানালিজম্ - বিরোধী কথাবার্তা স্বভাবতই বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো । কিন্তু কবি তাঁর প্রত্যয়ে অবিচল ছিলেন । 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই সংকীর্ণ জাতীয়তার বিকারকে এঁকে দেখালেন । জগদানন্দ রায়কে চিঠিতে লিখে জানালেন , — " ...Nationalism হচ্ছে একটি ভৌগোলিক অপদেবতা পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত", [৬] অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিবিধ বর্জনের প্রশ্নে কবির যে মনোভাব প্রকটিত হয় তা অনেকাংশে এই উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াপ্রসূত । ১৯২১ - এর ১৫ আগস্টে পঠিত 'শিক্ষার মিলন' বা 'সত্যের আহ্বানে' প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।

হোমরুল, কংগ্রেসের রাজনীতি, দেশের যুবকদের সৎ সাহস ও দুঃসাহসী একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, ছোট ইংরেজ, বড়ো ইংরেজ, স্বদেশী যুবকদের উপরে ছোটো ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচার প্রভৃতি প্রসঙ্গ যেগুলি একই সঙ্গে ভারতের রাজা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, উল্লেখ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন কবি তাঁর

****

৫। " Nationalism is a great menace" -
Nationalism, Rabindranath Tagore, Macmillan, 1976, Page - 67

৬। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য - প্রবেশক - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, (১৩৩৯)
৩য় খণ্ডে উদ্ধৃত , পৃষ্ঠা - ৬৩

বিবিধ রচনায়   ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল-এর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণের সময় (ডিসেম্বর, ১৯১৪) থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগের সূত্রপাত । গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ধারায় গান্ধীজীর ভূমিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও যুক্ত হ'য়ে পড়তে দেখা যায় নানাভাবে । গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণের অব্যবহিতপূর্ব - পর্বে বেসান্তই অন্যতম নেত্রী । বেসান্ত অন্তরীণাবদ্ধ হ'লে (১৬ই জুন, ১৯১৭) তার বিরুদ্ধে রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন (৪ আগস্ট, ১৯১৭) তাঁর রচিত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ । ১১ আগস্ট পুনরায় আলফ্রেড থিয়েটারে' একই প্রবন্ধ পঠিত হয় । 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি' গানটিও একইকালে রচিত ও সভায় গীত হয় । কংগ্রেসের কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ৩৩-তম অধিবেশনে শান্তিপ্রাপ্ত বেসান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে অভ্যর্থনা সমিতিতে মতভেদ দেখা দিলে যুবকদল রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে পৃথক অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে । প্রবীণদল বেসান্তকে সভানেত্রী করতে রাজী হ'লে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ছেড়ে দেন । বেসান্তের সভানেতৃত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে 'ইন্ডিয়াস্ প্রেয়ার' পাঠ করতে দেখা যায় ।

ভারতীয় রাজনীতির অপর বড়োদিক সাম্প্রদায়িক বিরোধ । শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনায় তাদের ভেদনীতির প্রভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন বার বার জ্বলে উঠতে দেখা গেছে যার পরিণতি ঘটেছে অবশেষে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে । রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকতে পারেন নি । ১৯১৭, সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের শাহাবাদ জেলায় হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হয় সেই দাঙ্গা ও এইসময়কার হোমরুলের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' [৭] প্রবন্ধে তাঁর

****

৭। 'ছোটো ও বড়ো' - প্রবাসী, ১৩২৪, অগ্রহায়ণ

বক্তব্য প্রকাশ করেন, "যে সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত – যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৌসুম হাওয়া আরব সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া – ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল – সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়।"

যুদ্ধশেষে ইংরেজ ভারতবাসীকে তাদের প্রত্যাশা স্বাধীনতার একটা বড়ো অংশ উপহার দেবে এই আশায় গান্ধীজীসহ তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধ প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে যখন সেই সময়ে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট পার্লামেন্টের এক ঘোষণায় বলা হয় যে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের অধিক সুবিধে দানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভারতবর্ষে একটি দায়িত্বশীল সরকার গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করা হবে। [৮] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি হ'লো "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রঙিন কল্পনার কোনো কারণ নাই, বিদেশী শাসনের হাতের দানের কোনো

* *

৮। 'The Policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire'. - C. A. Philips সম্পাদিত 'The Evolution of India and Pakistan' গ্রন্থের ২৬৪ পৃষ্ঠা থেকে উৎকলিত।

মূল্য নাই ।"[৯] রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে তাঁর জমিদারী এলাকায় পল্লী উন্নয়ন প্রয়াস শুরু করে দিয়েছেন চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্তকর্ম, ঋণদান ব্যবস্থা ও সালিশী বিচার এই পঞ্চবিধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে কেননা, সুকঠোর সাধনায় আপনার পথে আপন দেশকে সৃষ্টি করে তোলা তাঁর লক্ষ্য । 'স্বাধিকার প্রমত্তঃ' প্রবন্ধে লিখলেন, "বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে । আপনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন ।" "বাহিরের একজন আমার জন্য দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব" এ রকমের সুলভ পাওয়ায় আস্থা ছিল না কবির । মন্টেগুচেমসফোর্ড কর্তৃক শাসন সংস্কারে ভারতীয়দের হাতে শাসনভার তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি যে কতো মেকি তা অচিরেই প্রমাণিত হ'লো । এস. এ. টি. রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন[১০] অচিরেই প্রকাশিত হ'লো এবং তার ভিত্তিতে ফৌজদারী আইনের সংশোধনও করা হ'লো । এই আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় । হরতাল, হত্যাকাণ্ড, সহিংস, অহিংস সব রকম উত্তেজনায় দেশ

****

৯। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ২য় খণ্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ - ৪৭০

১০। রাউলাটকে সভাপতি করে ইংরেজ সরকার কর্তৃক যে কমিটি গঠিত হয় তাঁদের ওপর দুটি দায়িত্ব অর্পণ করা হ'য়েছিলো :

"(i) to investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in India,

(ii) to examine and consider the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies and to advise as to the legislation if any, necessary to enable Government to deal effectively with them".
- No 2884, Govt. of India, Home Dept., Delhi, 10th December 1917, Resolution.
Quoted in Sedition Committee (1918) Report, New Age, 1973.

তখন বিক্ষুব্ধ । সরকার পক্ষের অত্যাচার চললো ভারতবাসীর ওপরে , আর তার চূড়ান্ত কলঙ্কজনক অধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগে রচিত হ'লো । এই ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন । এই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ কবি রানুকে লিখেছিলেন,[১১] "তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ , পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও । এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে । ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে । মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে ।"

১৯২০, ৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের মূল প্রস্তাবে পরাজিত তুরস্কের প্রতি অবিচার , পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারের অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান না করার অভিযোগ তোলা হ'লো । দেশের সম্মান বজায় রাখবার একমাত্র উপায় হিসেবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হ'লো পুনরায় । আর এর জন্য উপযুক্ত পথ হিসেবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বানও জানানো হ'লো দেশবাসীর উদ্দেশ্যে । এই আন্দোলন চললো ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদেশভ্রমণ অন্তে দেশে ফিরলেন । কবির এই বিদেশভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর এই বিদেশ যাত্রার সঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ,[১২] — " ১৯১২ সালের বিলেতভ্রমণ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ ও তার ফলে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য স্মরণীয় । এর পরে তিনি বিলেত ও ইয়োরোপে বেড়াতে যান ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে , প্রথম মহাযুদ্ধের অল্প কিছুদিন পরেই । ১৯২০ ও ১৯২১ — এই দুটি বছরে আমরা ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশে ঘুরি এবং

* *

১১। ভানুসিংহের পত্রাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রসংখ্যা ৩৬, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ পৃষ্ঠা - ২৯৯ ।

১২। 'পিতৃস্মৃতি' — রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর , কলকাতা , ১৩৭৮, পৃষ্ঠা - [illegible] ১৬৩ - ৬৫

শীতের এক দীর্ঘ মরসুম কাটাই আমেরিকায় । এই দু - বছরে বাইরের জগৎকে আমরা যেমন অন্তরঙ্গভাবে চিনতে পেরেছিলাম , যেমনটা আর কখনো ঘটেনি । যুদ্ধের ফলে পৃথিবী ব্যাপী যে একটা বিরাট লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেছে - তার স্মৃতি তখনো সমগ্র সভ্য জগতের মনে জাগরূক । আরো একবার প্রাচ্যের মুখে তাকিয়ে পশ্চিম তখন ভাবছে , হয়তো পূর্বদিগন্ত থেকে আলো দেখা দেবে : সেই আলোতে তারা আবার নূতন করে পথ চলতে শুরু করবে । ঠিক এই রকম মুহূর্তে পশ্চিমী জগতে বাবার উপস্থিত যেন অলৌকিক আশীর্বাদের মতো মনে হ'য়েছিল প্রতীচ্যবাসীর কাছে । প্রাচ্য-খণ্ড থেকে বাবা যে বাণী বহন করে আনলেন , তা থেকে তারা যেন নূতন আশার ইঙ্গিত দেখতে পেল । "

কবি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে দেখলেন যে দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে । এই আন্দোলনের নেতিবাচক দিকগুলিতে তাঁর সমর্থন ছিলোনা যদিও তবু ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবকে তিনি স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেন নি । ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হওয়ার দু'দিন পরে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে যে খোলা চিঠি দেন তাতে তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতিকে দুর্বলতা ও কলুষমুক্ত ক'রে ভারতকে যথার্থমুক্তির পথে নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানান । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে দেশের মুক্তি অপরের হাত থেকে দান হিসেবে আসার নয় , তাকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ত্যাগের পথে , দুঃখ - বরণের মধ্য দিয়ে ।[১৩] কবি কয়েকদিন আগে গান্ধীজীর প্রকাশিত ভূমিকা সম্পর্কে এন্ড্রুজকে

* *

১৩। I have always felt, and said accordingly that the gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it.

And you have come to our motherland in the time of her need to remind her of her misuon to lead her in the true path of conquest, to purge her present day politics of its feebleness which imagenes that it has gained its purpose when it struts in the borrowed feathers of deplomatic dishonesty . গান্ধীজীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি । ১৬ এপ্রিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ - এ প্রকাশিত । — রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক তৃতীয় খণ্ডে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উৎকলিত ।

লেখেন, ১৪ এ ছাড়া ' Letters to a Friend ' - গ্রন্থ এ সম্পর্কেই এন্ড্রুজকে লিখেছেন — ' It is in the fitness of things that Mahatma Gandhi, frail in body and devoid of material resources, should call up the immense power of the meek, that has been lying waiting in the heart of the destitute and insulated humanity of India. The destiny of India has chosen for its ally, Narayana, and not Narayanasena, . . . the power of soul and not that of muscle. And she is to raise the history of man, from the muddy level of physical conflict to the higher moral attitude' .

অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় বর্জন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করতে পারেনি । যেহেতু 'নিছক শূণ্যতার নৈরাজ্যে' তাঁর আস্থা ছিলো না । রবীন্দ্রনাথের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে যে উদ্বেগ তাকে লক্ষ্য করে গান্ধীজী বললেন, ১৫
' In all humility, I shall endeavour to answer the poet's doubts. . . . The poet's concern is largely about the students. He is of opinion that they should not have been called upon to give up Government schools before they had

---

১৪। Non-co-operation : ' A farm of Himsa ' - Rabindra Nath Tagore, March 2, 1921; Letters to a Friend, PP. 127 - 28.

১৫। ' The Poet's Anxiety' - M. K. Gandhi - Young India, 1 - 6 - 1921, PP. 172 - 173.

other schools to go to. Here I must differ from him. I have never been able to make a fetish of literary training . . . Non-co-operation with evil is as much a duty as co-operation with good. I venture to suggest that the poet has done an unconscious injustice to Buddhism in describing nirvana as merely a negative state ' .
বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে নঞর্থক রূপে দেখা দিয়েছে তার কর্মী গান্ধীজীর কাছে তা সদর্থক । এখানেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য । বিলিতি বর্জন উপলক্ষে বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করতে পারেনি । বিলিতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যগ্রহণ এ সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে : [১৬]

' I venture to suggest to the poet that the clothes I ask him to burn must be and are his. If they had to his knowledge belonged to the poor or the ill-clad, he would long ago have restored to the poor that was theirs. In burning my foreign clothes I burn my shame, I must refuse to insult the naked by giving them clothes they do not need instead of giving them work which they sorely need'.

শরৎচন্দ্রের শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখা 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিলেন "মহাত্মা তাঁর সত্য প্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন । সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি ।" তবু গান্ধীজীর কর্মপন্থায় আচারাত্মক দিকগুলির সঙ্গে তার মতান্তরের কথা তিনি গোপন করে রাখেন নি । সকলে মিলে সুতো কাটা , কাপড় বোনা অর্থাৎ গান্ধীজী - নির্দেশিত 'চরকা'

....

১৬। The Great Sentinel - M. K. Gandhi, Young India, 13-10-1921, PP. 324 - 326.
Truth called Them Differently.

কাটার আহ্বানকে তাঁর মনে হ'য়েছে "একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্র'' তাক । 'চরকা' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত দেশবাসীকেও জানিয়েছেন কবি । চরকা বা বিলিতি বস্ত্র বর্জন তাঁর কাছে 'সহজিয়া' সাধন বলে বিবেচিত হ'য়েছে । 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধে গান্ধীজী কথিত স্বরাজ ও চরকার প্রসঙ্গে তিনি তাই মন্তব্য করেন, "স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন । একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তাঁর পথ ।" দেশের মুক্তির মতো এতো বৃহৎ এবং মহৎ নয়ো সংকীর্ণ পথ ধরে পৌঁছতে গেলে তার মধ্যে ফাঁকি থেকে যায় ।[17] স্বরাজের ভিত তার ওপরে গড়া উচিত নয় । প্রয়োজন আত্মশক্তির জাগরণ, আত্মনির্ভরতা, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ এবং পরস্পরের মধ্যে শুভ বুদ্ধির যোগ । গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ এই উভয় ব্যক্তিত্বের মতের মিল অমিলের সূত্র ধরে এগিয়েছে ।

ভারতীয় রাজনীতির এই পর্বের অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — সাম্প্রদায়িক সমস্যা । কোহাট মালাবারে মোপলা দাঙ্গা, কলকাতা শহরের ওপরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হ'য়ে যায় এই সময়ে । হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো । রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন । 'স্বরাজ সাধন' 'হিন্দুমুসলমান' বা 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রভৃতি রচনায় তার নিদর্শন মেলে । রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ঐক্য নিরপেক্ষ যে সামাজিক মিলন সাধনা সেখানেই হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে কাছে টানতে পারে এই ছিল তাঁর বক্তব্য । অপরদিকে

* *

১৭। চরকা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমতের সমালোচনার জবাবে লেখেন,

'Some have protested that they ever preached that only the turning of the charka should he engaged in. But they have not spoken of any other necessary work. Only one means of attaining Swaraj has been definitely ordered and the rest is a vast silence. Does not such silence amount to a speech stronger than any uttered word ? Is not the Charka thrust out against the background of this silence into undue prominence ? Is it really so big as all that ? ' -
Modern Review, September, 1925, PP. 263 - 70.

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারাও অব্যাহতগতিতে চলতে থাকে । সন্ত্রাসবাদী যুবক গোপীনাথ সাহার ক্রিয়াকলাপকে গান্ধীজী নিন্দার চোখে দেখেন অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন কর্তৃক তা প্রশংসিত হয় । রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের পথকে সমর্থন করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু এই দুঃসাহসী মৃত্যুপথিকদের নিঃস্বার্থ আত্মবলিদানের প্রতি কবি চিত্তের শ্রদ্ধা ও বর্ষিত হ'য়েছে । এদের ওপরে সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের তিনি প্রতিবাদ করেছেন মানবতার প্রয়োজনে । এইসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব প্রতিক্রিয়া স্বতঃই রবীন্দ্রনাথের মনের ওপরে ছায়া ফেলে গেছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পশ্চিমদেশে জীবনের কর্মচাঞ্চল্য, যৌবনের দুঃসাহসিক অভিযান, মুক্তবুদ্ধির জয়যাত্রা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছে । আবার সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অত্যাচার শোষণের নগ্নচিত্র, তাদের পরস্পরের মধ্যে লোভ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত বীজ বপনের দৃষ্টান্ত তাঁকে ব্যথিত করেছে । অন্যদিকে স্বদেশের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে পড়েছে অশিক্ষার অন্ধকারে ডোবা, কুসংস্কারের অজস্র বন্ধনে আবদ্ধ, অবুদ্ধির জালে জড়ানো শোষণে অত্যাচারে লাঞ্ছিত ক্লান্তশ্রান্ত অর্ধমৃত জীবনকে । বাইরের পৃথিবীর গতিময় জীবনের তুলনায় আপনদেশের নিশ্চল নির্বীর্য - জীবন - 'জীবনেরে খণ্ড ক্ষুদ্র করি' দণ্ডে দণ্ডে তার ক্ষয়' অসহনীয় মনে হ'য়েছে কবির কাছে । স্বতোস্ফূর্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে তাই জীবন - জাগানিয়া গান । 'বলাকা' অনেকটা সেই 'জীবন জাগানিয়া' কাব্য ।

(৬) বলাকা -

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধ শুরু হবার বছরেই রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ও প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্যে প্রমথ চৌধুরী বললেন,[১৮] 'বাঙলার মন যাতে বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্প বিস্তর সকলের হাতেই আছে।' সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে মানুষকে এই ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তুলবার অনেকখানি দায়িত্ব সেদিন রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র কবিমানসের অখণ্ড রসদৃষ্টি যৌবনের অখণ্ড রূপসৃষ্টি যেমন করেছিলো তেমনি রুদ্রদেবতা নটরাজকেও আবিষ্কার করেছিলো। এই রুদ্র ভাবনাকে কবি অভাবনীয় সংকেতময়তার মধ্য দিয়ে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। রুদ্র দেবতা নটরাজের রুদ্র আনন্দে ভীষণ এবং মধুর দুয়েরই ঝঙ্কার উত্থিত হয় আর তাতে যা ধূলায় মিশে যাবার তা ধূলাতেই বিলীন হয়, যা চিরকালের তা নিত্যরূপ লাভ করে। এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে কবির চিত্ত দুর্দম, যেন পরাঙমুখ না হয় - রবীন্দ্রনাথ সেই প্রার্থনা রেখেছেন রুদ্রদেবতার নিকট।

নটরাজ, আমি তব
কবি - শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি - মন্ত্র ল'ব।
তোমার তাণ্ডব - তালে কর্ম্মের বন্ধন - গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি,
সর্ব্ব অমঙ্গল - সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত - লয়ে।[১৯]

১৮। সবুজপত্র, ১৩২১, বৈশাখ।

১৯। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। বিশেষ সংস্করণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফাল্গুন, ১৩৮০, পৃষ্ঠা : ৮

বিশ্বসৃষ্টির প্রতিটি স্তরেই মহাকাল শিবের সম্পর্ক যে স্থাপিত সে সম্পর্কে নটরাজ কল্পনার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য গভীরতায় পূর্ণ । [২০]

"হায় শম্ভু , তোমার নৃত্যে , তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে , সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায় , ভালো মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল ।" তাই এই নটরাজই পারে দুঃসাহসী যৌবনকে উদ্ধার করতে । জীবনের জড়াবস্থা নয় , যৌবনের উদ্দামই কাম্য তার সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কাম্য পরিবেশের আনন্দ । 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটিতে এই ভাবনার কাব্যময় রমণীয় প্রকাশনা ঘটেছে । ইয়োরোপের নবীন প্রাণশক্তি এবং সেখানকার যৌবনের উচ্ছ্বাসও অনেকটা পরিমাণে এই পর্বে সবুজপত্রের প্রাণশক্তিকে তথা বাঙালী চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো ।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১, ২১, ২২, ৩৭, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতাকে সমাজ সম্পর্কের প্রত্যয় আর ৬, ৭, ৮ ও ৩৬ সংখ্যক কবিতাকে পরোক্ষ প্রভাবজাত বলে ধরা যায় । এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, বলাকাতেই প্রথম সার্থকভাবে ব্যক্তি ও বৃহৎ সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্র আবিষ্কার করে দেখালেন রবীন্দ্রনাথ । ১৩২১, ১৫ই বৈশাখ 'সবুজপত্রে' 'বলাকা'র প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' লেখা হ'লো এবং কবিতাটি স্বভাবতই সবুজপত্রের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেখা । ২, ৩, ৪ সংখ্যক কবিতাগুলি এই বছরেই জ্যৈষ্ঠ মাসের যথাক্রমে ৫, ৬, ১২ তারিখে নৈনিতালের রামগড় পাহাড়ে বসে লেখেন । বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লো ৪ আগস্ট । কাজেই কবি এই কবিতাগুলির প্রেরণা সম্পর্কে বলতে

....

২০। বিচিত্রপ্রবন্ধ (পাগল) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬৮ পৃষ্ঠা : ১০০ - ০১ ।

গিয়ে বললেন যে তাঁর এই প্রেরণা যুদ্ধের তাৎক্ষণিক অনুভূতি থেকে লেখা নয়। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরেই মৃত্যু, দুঃখ - বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ যুগ-সন্ধিক্ষণের সমাপ্তিতে নতুন যুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় সম্পর্কে অকারণ উদ্বেগ ছিল যার প্রতিশ্রুতি আছে উক্ত কবিতাগুলোতে। 'বিবেচনা অবিবেচনা' [২১] প্রবন্ধটি ১৩২১, চৈত্র মাসের মধ্যে লেখা। সেখানে তিনি বললেন, "চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযম ও আবশ্যক, কিন্তু অবিবেচনার বেগ বন্ধ করিব, আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না, — মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইও না, বুদ্ধিও চালাইও না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না।" — এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সে যুগের রাজনৈতিক ও সমাজসম্পর্কিত কর্ম ও ভাবনা যে বুদ্ধি বিবেচনাকে মূল্য না দিয়ে অন্ধ আবেগের বশেই চলছিলো অনেকটা পরিমাণে, এটা বেশ বোঝা যায়। এই সময়ের লেখা 'হালদার গোষ্ঠী' [২২] গল্পের বনোয়ারিলালের চরিত্রটিও 'অবিবেচনার' দোষে দোষী। একই সঙ্গে এই চরিত্রটির মধ্যে বিপ্লবীর মনোভাবও ফুটে উঠেছে। আর 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধটির যৌবনভাবনায় আছে 'শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস'। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই দুঃসাহসিকের দলই দেশে, সমাজে শান্তি আনবে — মুক্তি আনবে। জাতীয় জীবনে ধীরে ধীরে নেমে আসা অবসাদ ক্লান্তি সমাজের, জীবনের অগ্রগতিকে যেন থামিয়ে দিচ্ছে বলে কবির যখনই মনে হ'য়েছে তখনই তিনি জীবনে যৌবনধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। 'বলাকা'র প্রথম চারটি কবিতাতেই এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। পশ্চিম পৃথিবীর

****

২১। বিবেচনা অবিবেচনা — বৈশাখ ১৩২৬, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২২২

২২। হালদার গোষ্ঠী — বৈশাখ ১৩২৬, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৬০০ - ১৬।

কর্মচঞ্চলতাও কবির এই ভাবনাকে উৎসাহিত করেছে । 'সবুজের অভিযান' কবিতার একদিকে যৌবনের বেগ –

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা ।
        হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা ।
অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে -
        বাহির পানে তাকায় না যে কেউ ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
        জোয়ার - জলে উঠছে প্রবল ঢেউ ।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগহীন এই শহরের লোকেরা কর্ম থেকে আগ্রহ ঘুচিয়ে আচার সর্বস্বতার মোহে ডুবে ধীরে ধীরে জড়ত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে । এই আধমরাদের উপরে আঘাত হানবে নবীনদল,যৌবন । কবির প্রার্থিত এই যৌবনশক্তি অবুঝ , অশান্ত হ'লেও তারাই পারে সমাজ , ধর্ম , রাজনীতি , শিল্প , বিজ্ঞান সর্বত্র তাদের অফুরান প্রাণ ছড়িয়ে দিতে বাঁচার আনন্দ – জানার আনন্দ । কেননা, রবীন্দ্রনাথ সমাজের জন্য নানা আধুনিক চিন্তা ও শিল্পগত ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিও আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন । বলাকার ২ সংখ্যক কবিতায় কবি যে সর্বনাশের আগমন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন সেই সর্বনাশ আসবে সমাজে, জীবনে, সর্বত্র । আলস্য ত্যাগ করে অন্তর তাগিদ নিয়ে কর্মের পথে চলাই বাঞ্ছনীয় । তাহলেই সর্বনাশ আত্মার বীর্যকে বিনাশ করতে পারে না । যৌবনের যে রুদ্ররূপ কবি দেখতে চান তা এই কবিতাতেও ধরা পড়ে –

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস নে ।
ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে

কোণে আঁচল মেলিস নে ।
কিসের তরে চিত্তবিকল ,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল ,
বাহিরপানে ছোট্ না , সকল
দুঃখ সুখের শেষে গো ।

আর এরই পাশাপাশি রুদ্র পাগলের রূপও ফুটে উঠলো কবিতায় , কেননা দুইয়ের মধ্যে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ –

রক্ত - মেঘে ঝিলিক মারে ,
বজ্র বাজে গহন - পারে ,
কোন পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো ।

(২য় সংখ্যক কবিতা বলাকা)

মাথার উপরে মধ্যদিনের সূর্য আর তারই মধ্যে রুদ্রের আহ্বান কিন্তু এই ভয়ংকরতা , বিপদ , বাধা , মৃত্যু এসব লঙ্ঘন করেই একদিন অমৃতত্বের আস্বাদ পাওয়া যাবে । ঝড়ের মেঘের একটা প্রতিভাস সৃষ্টি করে আসন্ন সর্বনাশের রূপটি স্পষ্ট করে তুলবার আয়োজন চোখে পড়ে । আবার ঝড়ের পরের শান্ত অবস্থাটিও আশার বানী জোগায় – নতুন আলোর সন্ধান চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায় । যৌবনই বলতে পারে –

আমরা চলি সমুখপানে ,
কে আমাদের বাঁধবে ।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে ।

ছিঁড়ে বাধা রক্ত - পায়ে ,
চলবে ছুটে রৌদ্রে ছায়ে ,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে ।
কাঁদবে ও কাঁদবে ।

বলাকার ৩ সংখ্যক কবিতায় এই উচ্চারণের পরেই ৪ সংখ্যক কবিতায় লিখলেন –

কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে ,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক ।

এই সর্বনাশ জীর্ণ - পুরাতনের পক্ষে সর্বনাশ , কিন্তু নূতনের পক্ষে আগমনী । প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে যেন ঊনিশ শতকের যথার্থ সমাপ্তি হ'লো । ঝড়, সর্বনাশ ইত্যাদির চিত্রকল্পে তাই যেন মনে হয় কবির প্রফেটিক ভিশন-ই ধরা পড়েছে । এই আতঙ্কই কবিতাটির এবং জীবনেরও কান্না সুর কবির মতে । মহাযুদ্ধ তখনও শুরু না হলেও কিন্তু ভিয়েনায় , বার্লিনে , প্যারিসে , লণ্ডনে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব পুরোমাত্রায় চলছিল । কবি স্বয়ং যেন যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন । ৪ সংখ্যক কবিতার সূচনাতেই শোনা যায় –

তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে ,
কেমন করে সইব । –

এ ব্যাপারে কবির বক্তব্যও খুব স্পষ্ট । "বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয় – অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে । ঔদাসীন্যভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই । সময় এলেই দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে ।"[২৩]

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হ'লো ৪ আগস্ট আর ৫ আগস্ট 'মামা হিংসীঃ' ভাষণ দিলেন কবি মন্দিরে আর তাতে আকুল প্রার্থনা জানালেন,[২৪] "বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো । মা মা হিংসীঃ । বিনাশ থেকে রক্ষা করো ।"

যুদ্ধের গোড়া থেকেই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কবি ভাবছেন । বেলজিয়ান সৈন্যের যুদ্ধ কৌশলে খুব আশান্বিত হ'য়ে ৪ ভাদ্র, 'গীতালি'তে লিখলেন –[২৫]

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
        মরতে হবে ।
পথ জুড়ে কী করবি বড়াই ?
        সরতে হবে ।

– আর ৫ ভাদ্র লিখলেন বলাকার পাঁচ সংখ্যক কবিতাটি (১৩২১, ৫ ভাদ্র) । এই কবিতাটির ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের চিন্তা আছে সে কথা কবি নিজেই বলেছেন । প্রচণ্ড বিভীষিকাময় অন্ধকার নেমে এসেছে ইয়োরোপে আর এই দুর্যোগের মধ্য থেকেই চিনে নেওয়া যাবে প্রকৃত মানবপ্রেমিককে । যুদ্ধের খবরে রবীন্দ্রনাথের মন যেমন অস্থির,

****

২৩। গ্রন্থপরিচয়, অংশ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা - ৫১৩ ।

২৪। মা মা হিংসী - (২০ শ্রাবণ, ১৩২১) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - পৃষ্ঠা - ৪১৭

২৫। গীতালি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩১২ ।

তেমনি আবার রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির লেনিনের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ - বিরোধী মনোভাব তা আনন্দ দেয় কবিকে। অত্যাচারিত, অবহেলিত, দীন অপৌরুষার পৌরুষ এই যুদ্ধ ঝড়ের মধ্য দিয়েই একদিন ঘোষিত হবে এই বিশ্বাস কবির। এরই জন্য জীবন - নায়ক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও তরী বেয়ে চলেছেন —

কালো রাতের কালি - ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূল ছাড়া মোর নেয়ে।

এবং তারপর 'তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম জানি' তার দুয়ারে অর্থাৎ কবির অপৌরুষার দুয়ারে নীরবে দেখা দেবেন, – ধনবন্ত সাম্রাজ্যবাদি, বস্তুবাদ প্রভৃতিতে অপৌরুষাকে জর্জরিত না করে মানবিকতার চিরসৌন্দর্যে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবেন বিশ্বের মাটিতে। বেলজিয়াম, রাশিয়া কবির মনে এই আশা জাগিয়ে তুলেছিলো। ১ - ভাদ্র ১৩২১, শান্তিনিকেতনে মন্দিরের ভাষণে 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন কবি। প্রবন্ধটিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিধাতার কাছে বিশ্বপাপ মার্জনার প্রার্থনা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য কবিতাটিতে ব্যক্ত জীবনের গতি ও মানবিকতা সম্পর্কেও আশান্বিত হ'য়ে উঠলেন, –

"আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'য়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হ'য়ে ওঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। ... ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এই জন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর, কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে

গভীর , পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে । ... এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয় , রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয় , কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সবচেয়ে কঠিন ।" [২৬]

— 'বিশ্বপাপ মার্জনা করো' এই প্রার্থনাই 'শান্তি' কবিতাটির মধ্যে অভিব্যক্ত । যুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দূর হবেই আর পৃথিবীর মানব সমাজও নতুন করে বাঁচার প্রস্তুতি নেবে — কূলহারা জীবন তরীর নেয়ে কূলে এসে দাঁড়াবে ।

লোভ , হিংসা , অত্যাচার , শোষণ প্রভৃতি জীবনে উৎপাত ঘনিয়ে এনে দিচ্ছে । যুদ্ধ তাই অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছে যেমন, তেমনি তারই মধ্য থেকে শুভবোধ, মঙ্গলবোধ জেগে উঠবে বলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস । কেননা বিধাতার হাতের মঙ্গল শঙ্খ যতক্ষণ পর্যন্ত ধূলি লুণ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থাটি কবির চোখে অসহনীয় । ১৩২১ , ১২ পৌষ রুদ্রদেবতার কাছে এর জন্য কবি বিচার প্রার্থনা করে 'বলাকা'র (বিচার) ১১ সংখ্যক কবিতাটি লিখলেন । পূর্বোল্লিখিত কবির 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয়ের অভিপ্রকাশই এতে লক্ষ্য করা যায় । যুদ্ধ চলছে , কবির মনও তাই বিচলিত । ১৩২১, ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে উৎসবের দিনে তাঁর ভাষণে সেই মানসিক অবস্থাটিই প্রকাশ পেলো ,— "একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে । সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী — দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা ।"

****

২৬। পাপের মার্জনা (১ ভাদ্র, ১৩২১), রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৪১৮ ।

বিধাতার ভাণ্ডার সিঁধ কেটে চুরি করে ধনলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি। দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক হিংসা, আক্রোশে লিপ্ত থেকে বীভৎসতা সৃষ্টি করার সঙ্গে 'সিঁধ কেটে' চুরি করার উপমাটি ১১ সংখ্যক কবিতায় চমৎকৃতি লাভ করেছে। কবির মতে পাপের ভার এই চৌর্যবৃত্তির দ্বারা লাঘব করা যায় না। এই সব পাপের জন্য রুদ্রের কাছে কবি মার্জনা, ভিক্ষা করেছেন, যা এই পাপের আবর্জনাকে অপসারিত করতে পারে — সেই ঝড় ঝঞ্ঝা আর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কবি দেখেন, —

> চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
> প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে,
> সেই ঝড়ে
> ধূলায় আহারা পড়ে,
> চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
> সে — বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
> (১১ সংখ্যক। বলাকা)

যে সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ এ যেন তারই প্রতি ইঙ্গিত। প্রকৃতির কঠোর রূপের মধ্যে রুদ্রের যে আবির্ভাব তাই মানবজীবনের সংঘাত, যুদ্ধ, রক্তবন্যার মধ্যে দিয়েও উচ্চকিত। পরিপূর্ণ করুণার মধ্য দিয়ে একদিন ক্ষমা নেমে আসে পৃথিবীতে। জননীর স্নেহ অশ্রু, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস, সতীর পবিত্র লাজ আর সখার হৃদয় রক্তপাতেই দম্ভ, উদ্ধতা, আঘাত, বিদ্রোহ - লোল সব কিছুকে পরম করুণায় ক্ষমা করছে। লীলাময়ের প্রকাশে যে কঠোরতার সঙ্গে কোমলতা-ও বিদ্যমান। রবীন্দ্র - মানসিকতায় হতাশার মধ্যে আশাবাদের চিরন্তন প্রকাশ দেখা দিয়েছে, তাই তাঁর বিশ্বাসে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, মানবদলনের অবসানে ইতিহাসবিধাতা একদিন পূজো গ্রহণ করবেন। রুদ্রের মার্জনা নেমে আসতে দেখেছেন কবি, — (১১ সংখ্যক কবিতা, বলাকা)

গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয় শিখায় ,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ।

এই সংঘাতের মধ্যেই যে বিশ্ববিধাতার কল্যাণমূর্তি জেগে ওঠে তা ২২ সংখ্যক কবিতায় ১৩২১, ১৯ মাঘ, বলেছেন ,–

আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদ চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি ।

আঘাত সংঘাতের মাঝখানে বিরাগ, প্রমাদের কুশাঙ্কুরকে স্বীকার করে নিয়ে বৃদ্ধ যৌবনকে মুক্তির পথে চলার আহ্বান জানালেন এ কবিতায় এবং ২১ সংখ্যক কবিতাতেও । সেখানেও বুদ্ধভাবনা, রৌদ্রপায়ী চাঁপার উৎসুক্য আর উন্মত্ত বকুলের শিষের দোলা অবিবেচনার পথের প্রতি ঝোঁক এসেছে । গতিতেই মুক্তি । তাই এই মুক্তি এই গতি বারবার রবীন্দ্র কবিতায় এসেছে । এরই ফলে যা ধূলায় মিশবার তা ধূলায় মিশে যায় – যা থাকবার তা চিরন্তন হ'য়ে ওঠে । অন্যায় অত্যাচারের অবসানে লাঞ্ছিত অপমানিতের – অগৌরবার একদিন যে জয় হবেই –

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায় ।
ঘর ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তি-মদে করল মাতাল ।
খসে পড়া তারার সাথে
নিশীথ রাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতলপানে
মরণ-টানে ।

(২২ সংখ্যক কবিতা বলাকা)

মহাযুদ্ধ দারুণ তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত যখন, তখন ১৩২২, ২৩ কার্তিক 'বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক কবিতাটি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতায় যুদ্ধ প্রসঙ্গ এলো অনিবার্যভাবেই। কবি জানেন যুগ যুগ ধরে –

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি - অভিমান –
(৩৭ সংখ্যক, বলাকা)

এইসব জমতে জমতে বর্তমান পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর পরিবেশকে সৃষ্টি করেছে। ভয়ঙ্করতা যদি অনিবার্যই হ'লো, তাহলে, কবিরও প্রার্থনা মাথার উপরে প্রচণ্ড উন্মত্ততায় ঝড় ভেঙে পড়ুক তার 'নিখিলের যত বজ্রবাণ' এই ঝড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঝড়ের অবসান ঘটুক। পৃথিবীব্যাপী হাহাকারের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু ধ্বংস নয়, জগতের শুভযোগের আসন্ন লগ্নটিকেও দেখতে পেয়েছিলেন –

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?
(৩৭ সংখ্যক । বলাকা)

এ শুধু প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে প্রত্যাশিত আবির্ভাবের কল্পনা। কবির বিশ্ববীক্ষণের দৃষ্টির নেশা জেনেছে যে বীরের রক্তস্রোত, মায়ের অশ্রুধারার সব মূল্যই ধরার ধূলায় নিঃশেষিত হবে না। পৃথিবী জুড়ে অপমানের মধ্যে বন্ধন ছাড়ার প্রলয়মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে বলেই কবির বিশ্বাস। কবি

এই কথাই শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের ভাষণে বলেছেন ,[২৭] "উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে : যাত্রী বেরিয়ে এসো , বেরিয়ে এসো । ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার ।" [২৭]

১৩২২, ৪ চৈত্র ('যৌবন') বলাকার ৪৪ সংখ্যক কবিতায় দুঃসাহসী যৌবনের সংগ্রাম - সম্ভাবনার চিত্রই আছে । যুদ্ধপর্বের পৃথিবীতে ও পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি দূর করতে কণ্টকাকীর্ণ পথের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত সাফল্য জয় করে আনতে পারে একমাত্র যৌবনই তার যৌবনের প্রশস্ত মরণ পাত্রে অপেক্ষমান অমৃতরস । বাংলার যুবমনের সংগ্রাম চিন্তাই যেন এ কবিতায় ভাষা পেয়েছে বলে মনে হয় । রবীন্দ্রনাথের গ্রামোদ্যোগ কর্মসূচীকে সফল করতে এই যৌবনকেই প্রয়োজন হ'য়েছিল । শুধু দেহের যৌবন বা বার্ধক্য নয়, দেহের ঊর্দ্ধে মনের যে নবীন সচলতা তাকেই কবি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা করেছেন –

> খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
> ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
> জীর্ণতারি বক্ষ দু - ফাঁক করে
> অমর পুষ্প তব
> আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
> ফুটুক নিত্য নব ।
>
> (৪৪ সংখ্যক । বলাকা)

'বলাকা'র প্রথম চারটি কবিতায় ও গোটা বলাকা পর্বেই কবির এই কামনা লক্ষ্য করা যায় । কারণ কবি এই পর্বে কর্মযজ্ঞের কথা ভেবেছেন বেশী

* *

২৭। মাঘোৎসবের ভাষণ – যাত্রীর উৎসব সন্ধ্যার উদ্‌বোধন - ১৩২১, ১১ই মাঘ, রবীন্দ্ররচনাবলী - দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ: - ৪৭৪ ।

করে। বলাকার কবিতা রচনার সময়ই রবীন্দ্র - অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেশসেবীদের সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ 'কর্মযজ্ঞ' ও 'পল্লীর উন্নতি' লিখলেন। 'কর্মযজ্ঞ' হিতসাধন - মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম। এতে বললেন, — "দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। ... কিন্তু সবচেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকার গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই তা আমি জানিনা। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই।

... কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি — আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ গ্রহণ করতে গিয়ে মরিনি, আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়।" [২৮]

'পল্লীর উন্নতি' হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত এবং পরে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত। পল্লীর উন্নতি ও পল্লীগঠনের কাজে যুবকদের আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। শুধু মুখে বলাই নয় কাজেও দেখা গেলো যে 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী'র মাধ্যমে পল্লীর উন্নতির কাজে যুবকদের নিয়োজিত করবার চেষ্টাও চললো। ১৩২২, বৈশাখ থেকে সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় কবির 'ঘরে - বাইরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে থাকলো। তাতেও দেখা গেলো যে, নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নতি এবং 'স্বদেশী - সমাজ' ভাবনায় অনেকখানি অনুপ্রাণিত করে তুললেন।

২৮। কর্মযজ্ঞ (সবুজপত্র, ১৩২১ ফাল্গুন) রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ - ৪১০ - ১৭

তার সন্দীপের মধ্যে দেখা গেলো সেই সময়ের বাংলার বিপ্লববাদের আংশিক স্বরূপ ।

যে যৌবনের কথা কবি বলাকার অনেক কবিতাতেই ভাবে, ভাষায়, ছন্দে তুলে ধরেছেন সেই যৌবনের প্রতিই পুরাণো জীর্ণ রাত্রির অবসানলগ্নে নববর্ষের আশীর্বাদ পৌঁছে দিয়েছেন কবিতায় । কবিতাটি ১৩২৩, ১ বৈশাখ লেখা । আর ৪৪ সংখ্যক ('যৌবন') কবিতাটি ১৩২৩, ৪ চৈত্র লেখা । ইতিমধ্যে কবির আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এলো ; মনের মধ্যেও তাগিদ এলো। যৌবনের সুপ্ত-শক্তিকে অভিনন্দিত করে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণ করলেন। 'পথ' রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম প্রিয় উপলব্ধি , কেননা এই পথেই আছে গতিমুক্তি সব । যারা অলস নয় , জড়তায় যারা আচ্ছন্ন নয় , – যাদের মধ্যে আছে বন্ধনহীন চঞ্চলতা, কৌতূহল, জানবার আর দেখবার অদম্য আগ্রহ, মনের অটুট শক্তি ও দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে তারাই কবির ঈপ্সিত পথের যাত্রী । এই যাত্রীরই জন্য —

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ ,
            শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা ,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা ।
            নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
            এই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।
        –৪৫ সংখ্যক কবিতা , ১৩২৩ , ১ বৈশাখ ।

শান্তি , আরাম , বিশ্রাম সুখ নয় – ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পথ করে চলা আর এই দুর্গমযাত্রার দুঃখকণ্টকে বরণ করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই যৌবনের ধর্ম । এর জন্য রুদ্রের আশীর্বাদই তাদের চলার পথে পাথেয় । রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে ও যুদ্ধোন্মাদ বহির্বিশ্বের নানাবিধ অশান্তি, অত্যাচার, শোষণের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দেশের ও বিশ্বের যুবশক্তিকেই ডাক দিয়েছেন প্রকারান্তরে । এই পথের যাত্রীদের আশীর্বাদ জানাবে কালবৈশাখী , কেননা কালবৈশাখী প্রচণ্ড উন্মত্ততায় যা জঞ্জাল, অর্থাৎ যা জীর্ণ তাকে নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে যায় আর যা

চিরসত্য যা থাকবার তা ঠিকই থেকে যায় । এই চলার পথটি যে সহজ নয়, দুর্গম তাই তা কণ্টকময় । শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদে ঘোরতর বিপদের প্রসঙ্গ দ্যোতিত করে আর 'শৃঙ্খলিত শৃঙ্খলা' শব্দদুটি বাঙালী যুবকদের উপরে বৃটিশ শাসনের অত্যাচার সম্পর্কে সার্থক ইঙ্গিত বহন করে ।

এই যৌবনবন্দনার সূত্রপাত দেখে মনে হতে থাকে — এই যৌবনের উৎসাধার অনেকটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই । ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দ্বার তাঁর কাছে প্রশস্ততর হলো । তিনি হলেন বিশ্বের কবি । বিশ্বের সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্ত সময়ে কিছু বলবার , নিজস্ব মতামত দেবার প্রয়োজনও দেখা দিতে লাগলো । ঘরের বাইরে বেরোতে গেলে — বিশ্বের তালে তাল রেখে চলতে গেলে মনের অমিত তেজ , সামর্থ্য , সদিচ্ছা থাকা দরকার নিঃসন্দেহে । কাজেই দৈহিক বয়সের ছাপ রবীন্দ্রশরীরে পড়লেও মনের গড়ন এই সময় থেকেই যেন নবযৌবনপ্রাপ্ত হ'লেন কবি । আর তাঁর নিজের দেশের প্রসঙ্গও তুচ্ছ তো নয় । মনের যে চঞ্চলতা নিয়ে বিদেশের সঙ্গে যোগ সূত্র স্থাপন করলেন তা দেশের দুর্দিনে, পরাধীন ভারতের অত্যাচারিত অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়াবার কাজে লাগলো । নিজের শক্তি--সামর্থ্যকে বাইরেও দেখতে চাইলেন — দেশের যৌবন শক্তিকে তাই সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে , নারীমুক্তির সপক্ষে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির সপক্ষে সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপে দেখতে চাইলেন।ঠিক এই সময়েই 'সবুজপত্র'-ও সবুজের গান গেয়ে উঠল দেশেমনে অমিত তেজ ও উৎসাহ ভরে নিয়ে । এর সঙ্গেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । অন্যদিকে শুরু হ'লো বিশ্বযুদ্ধ । সেখানেও যে দারুণতম চাঞ্চল্য । এ সমস্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যা রাখবার তাকে রাখতে পারে , যা দূর করবার তাকে দূর করতে পারে যৌবনশক্তিই । আর এরই সঙ্গে মিলেছে রবীন্দ্রনাথের রুদ্র কল্পনা । নটরাজ আমাদের জীবনের মঙ্গল - অমঙ্গল , উত্থান - পতন দুইয়েরই ধারক ও বাহক । তাই যৌবনশক্তির তুলারূপ হিসেবে কবির মনে এই নটরাজের কল্পনাই জেগেছে বারবার ।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার প্রভাবই পরোক্ষভাবে বলাকার ৬(ছবি), ৭ (সাজাহান), ৮ (চঞ্চলা), ৯ (তাজমহল), ৩৬ (বলাকা) প্রভৃতি কবিতায়ও প্রতিফলিত হ'য়েছে । জীবনের একদিকে স্থিতি , সেখানে জমে ওঠে পৃথিবীর হানাহানি, অসন্তোষ, যুদ্ধ, বিবাদ বিসম্বাদ, কু সংস্কার, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন । অন্যদিকে স্থিতির বাধাও অতিক্রম করে যেতে হয়;-সেখানেই গতি । প্রথম মহাযুদ্ধের যে উম্মত্ততা দিকে দিকে, অত্যাচারিত পরাধীন ভারতবর্ষের যে গ্লানি - কবির বিশ্বাস এসব যন্ত্রণা একদিন কেটে যাবেই গতির আবেগে । গতিই জীবনের ধন । এই গতিতেই জীবনের স্বতোস্ফূর্ত চঞ্চলতা, অস্থিরতা আর তাতেই জীবনের প্রাণ কেন্দ্র উচ্ছ্বসিত । যা অস্থির যা চঞ্চল তাই গতিপ্রান্ত - তাই সত্য । 'ছবি' (১৩২১, কার্তিক) কবিতাটিতে প্রেমস্মৃতি উদ্বেলিত তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতির প্রশ্নটি চিন্তার প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত । একদিন ছবির আসল মানুষটি বেঁচে ছিল 'বিশ্বতালে রেখে তাল' কিন্তু আজ সে স্থির গতিহীন । এই গতিহীনতাই কবির চোখে অসহনীয় । তাই ছবির কাছেও কবি প্রশ্ন রেখেছেন ,-

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন ।

তবু কবি আপন অন্তরের গতি দিয়ে ছবির স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন - তাতে বিশ্বব্যাপ্তির স্বর্গরচনা করেছেন । এই ব্যাপ্তি এসেছে কবির চলার পথে। এই 'ছবি' কবিতাতেই কবির মানস উপলব্ধি —

সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন - নির্ঝরিনী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী ।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে ,
মেতেছি পথের প্রেমে ।

গোটা বলাকা কাব্য জুড়েই জীবনের অস্পষ্ট বাধা ও বাধা অতিক্রান্তির সুর - অজানা পথের প্রেমের আহ্বান ধ্বনিত । মরণের কিঙ্কিণী বাজিয়ে সহস্র ধারায় যে জীবনে নির্ঝরিণীর ছুটে চলার ব্যগ্রতা - ই কবির আকাঙ্ক্ষিত যৌবন - আবেগ ।

এই যৌবন ধর্মকেই, গতির আবেগকে চলার আগ্রহকেই কবি বলাকার কবিতাগুলোতে স্পষ্ট করে পেতে চেয়েছেন জীবনের ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে। ৭ সংখ্যক কবিতায় (সাজাহান, ১৩২১, ১৪ কার্তিক) অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, [২১]
"সাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না – ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ছেড়ে তাঁর চলে যেতেই হয়। পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না।" – এইভাবেই কবি দেখেছেন বিশ্বের চলার ছন্দকে। মানুষের আয়ুর সীমা আছে আর সেই মানুষকে নিয়ে তৈরী বিশ্বের উদ্ধত স্পর্ধারও সীমা আছে। কবি ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখেছেন নানা অশান্তি, বিপদ আর এসব মাঝে মাঝেই জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে দিলেও এক সময় দুর্যোগের মেঘ কেটে যাবেই এটাও কবির বিশ্বাস। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হবেই ভারতেও স্বাধীনতা আসবেই। আবার এই সুখের, শান্তির দিন ও জীবন, যৌবন, ধন, মান পুনর্বার ভেসেও যাবে কালস্রোতে।

১ (তাজমহল, ৫ পৌষ, ১৩২১) কবিতাতেও দেখা যায় তাজমহলকে কেন্দ্র করে স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হলেও সম্রাট মহিষীর প্রেমের স্মৃতি ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে সর্বলোকে জীবনের অক্ষয় আলোকে প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এক অখণ্ড প্রবাহধারায় এঁকে তুলেছেন তাঁর চিন্তায়। ৮ সংখ্যক (চঞ্চলা, ৩ পৌষ, ১৩২১) কবিতায় নদীর চলা আর জীবনের চলার ছন্দ একসুরে মিলে গেছে। এই চলার প্রতিমাকে চঞ্চলা, অপ্সরী

****

২১। রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় অংশ, পৃষ্ঠা : ৫১৪

অলক্ত সুন্দরী ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। আপনার সঞ্চয় একদিন আপনারই সামনে ভয়ঙ্কর বাধার সৃষ্টি করে আর সেই বাধাকেই অতিক্রম করে যাবার বার্তা আছে নদীর একান্ত করে চলার মধ্যে। জীবনও এই কথাই বলে। বন্ধতারের যন্ত্রণা কবি দেখেছেন পৃথিবীর বুকে মানুষের সমাজে। এক একটি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষের সমাজ আবার তাকে কাটিয়েও চলেছে। এই বাধাতিক্রমণের আনন্দবেগ জীবনও নদীর ক্ষেত্রে একই রকম বলে বন্ধতারে, আবর্ত্তনায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে পৃথিবীর নিত্যজ্যোতি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায় না। কূল ও কবির কাম্য কিন্তু কূলের আবদ্ধতা নয় — অজানা সমুদ্র পথে পাড়ি জমানো, অকূল আলোকে পৌঁছানোও কবির উদ্দেশ্য। সেই প্রার্থনা ৮ সংখ্যক 'চঞ্চলা' কবিতায় —

সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে — অকূল আলোতে।

৩৬ সংখ্যক (বলাকা, কার্তিক ১৩২২) কবিতা কবির অভিপ্রেত মতটিকে তুলে ধরেছে আর 'বলাকা' নামের মধ্যেও তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আকাশপথে বুনোহাঁসের ঝাঁক যে দল বেঁধে এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ের জন্য উড়ে চলে গেলো — এ দৃশ্যে কবির মনে বিশ্বের চলার ছন্দই মুকুলিত হ'য়ে উঠলো, —

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

বিশ্বের পরিবর্তনশীলতা, জীবনস্রোতের অসীমতা চলার পথে বাধা পেয়ে যদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে একটা বিপরীত গতির যে সৃষ্টি হয় – ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ তাকে 'বস্তু'বলেছেন। বের্গসঁ এবং তাঁর দর্শনের এসব তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। তবু রবীন্দ্রচেতনায় গতিদর্শন বের্গসঁ প্রভাবিত নয়। তাঁর আপন জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর প্রকৃতিচেতনা (নিরন্তর গতিচঞ্চল পদ্মার সঙ্গে তার সহবাস স্মরণীয়) সামাজিক চেতনার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে অভিনব উপলব্ধি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। নদীপ্রতীকে এই উপলব্ধিকে ব্যক্ত হতে দেখা যায় –

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে,

অসীম আকাশের পটে উড়ন্ত পাখির পাতিতে মুখর গতি চঞ্চলতা জেগেছে শূন্যে জলে স্থলে এই আন্তরসত্যের কেন্দ্রবিন্দুটি স্থাপিত রয়েছে 'বলাকা'র আলোচিত কবিতাগুলোতে। তৎকালীন সমাজমন, রাজনৈতিক জীবন কী দেশের, কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে – সর্বত্রই বিশ্বজগৎ এক বিপুল পরিবর্তনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যে ছিল – সেই ভাবনাই তো বলাকার পংক্তিতে ছন্দ মিলিয়েছে। বলাকার কতকগুলো কবিতায় (উল্লিখিত রয়েছে) প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ - ঝড় ও দেশীয় ঘটনাবলীকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু আবার এসব কবিতাতে ঘটনার সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন কবি বৃহত্তর মানবমুক্তির প্রশ্নে। কতকগুলো কবিতায় (উল্লিখিত হয়েছে) আবার পরোক্ষভাবে হলেও বাস্তব ঘটনারই চালকশক্তির, জীবনশক্তির গতিচঞ্চল রূপকে ভাষা দিয়েছেন। বাস্তবের কর্মচঞ্চলতার মধ্যে সেই গতিই ধ্রুবসত্য।

পলাতকার 'ছিন্নপত্র' ও 'আসল' কবিতার কাহিনী দুটির মধ্যে কবি নায়কের কর্মব্যাকুল জীবনের দিনরাত্রি, ভোটপর্ব সভাসমিতির ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে তার জড়িত হয়ে পড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া , রাজনৈতিক কর্মীর কার্যকলাপের বাস্তব প্রসঙ্গও কবিতা দুটির মধ্যে দেখা দিয়েছে ।

যেমন ছিন্নপত্র কবিতায় –

তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ ,
দৈনিক আর সাপ্তাহিকে ছাপতে হত নকল সিংহনাদ ,
যৌবন কুঞ্জে মিটিং হলে আমি প্রথম বক্তা ,
রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা ,
যুদ্ধ হত সেনেট - সিণ্ডিকেটে ,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে ।

আবার 'আসল' কবিতায় –

পাগল করে দিল পলিটিক্সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা আজকে সংবাদ হয়নি জানা ঠিক সে ,
ইতিহাসের নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত ।
যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হচ্ছে অশ্রাব্য ।

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে এই পর্বে যোগ দিতে হ'য়েছিলো এবং তিনি দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কেও প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার সভা সমিতিতে তা পঠিত করেছেন ।

এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত 'ছাত্রশাসনতন্ত্র', (সবুজপত্র, ১৩২২ চৈত্র), 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪, অগ্রহায়ণ, প্রবাসী) ব্যতীত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি ১১ আগস্ট ১৯১৭, কলকাতায় আলফ্রেড থিয়েটারে কবি পাঠ করেন । সেখানে বললেন, [৩০]

"রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয় । কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণী বিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায় ।"

দেখা যায় এই প্রবন্ধটির বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলো সেদিনের 'নারায়ণ' পত্রিকা । তাঁর পূর্বোক্ত কবিতা দুটির মধ্যে দেশের আত্মান্তরীন পলিটিক্সের চিন্তা, বিদেশী শাসকদের স্বেচ্ছাচারী শাসনযন্ত্রের প্রতি অনীহা প্রকাশিত এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে মাসিক পত্রে শুধুই বাগাড়ম্বরের প্রসঙ্গেও কবি যেন ক্ষুব্ধ । কিন্তু মন ক্ষুব্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত কবিজনোচিত উপায়ে মনকে শান্ত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ । পাগলা মহেশের কাছে পালিয়ে গিয়ে বর্তমানের বঞ্ঝাটের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন –

ভুলে যেতেম রাজার বা'রা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
বালুর'পরে রেখার মত পড়েছে রাস্তা, নিখছে বিধানবিধি ।

****

৩০। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম – ভাদ্র, ১৩২৪, রবীন্দ্ররচনাবলী । ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ । পৃষ্ঠা :- ২৩৪

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'পূরবী'র কবিতা লিখেছেন। 'পূরবী'র কবিতায় তাঁর বাস্তব সমাজ ভাবনার ছাপ তেমন নেই বললেই চলে। তবে একটি কবিতাতে সে ভাবনার খুব বিস্তারিত পরিচয় আছে। সেটি 'চিঠি' (২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪) কবিতা। দিনেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এটি মূলতঃ চিঠি-ই তবে ছন্দে গাঁথা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংবাদ ও শাসকবর্গের অত্যাচারের খবরে কবির মন যে জর্জরিত কবি তা তুলে ধরেছেন ঐ 'চিঠি'তে। রবীন্দ্রনাথ তখন আছেন দক্ষিণ আমেরিকায়। প্রবাস জীবনে শায়ন, কোমলা প্রাণসম্ভায় ভরা বাংলার জুঁই ফুলের ঘ্রাণের জন্য কবিমন হয়ে উঠেছে উতলা, ঘরের প্রতি আকর্ষণ রেখেছে কবির তার দেশের যন্ত্রণায় তাঁর ব্যথিত হৃদয় দেশের খবরের প্রত্যাশায় ব্যাকুল, —

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশ পাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলা দেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

কবির মন উদ্‌গ্রীব অন্য ভাবনাতেও, একই সঙ্গে জীবনপ্রাণে বেণুবীণার নম্র আসে। মেশীনপান এর সম্মুখে তাই জুঁইফুলের গান গেয়ে ওঠেন। কেননা —

যেদিন ওরে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো তো সাজাবে তুই দেবার্চনার থালা ।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা ,
নড়বে তারাই চিরটা কাল ? পড়বে পাষাণ কারা ?

এ কথনোই সম্ভব নয় — কেননা , ইতিহাসই তুলে ধরে শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের অবস্থা । কেবল এক - একটি দীর্ঘশ্বাস নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আকাশকে সকরুণ করে তোলে । সবাস্তব প্রসঙ্গে স্বীকার করেও নিত্যযোগের আনন্দ সুর মেলান কবি — রবীন্দ্রনাথ । তাই কবির স্পষ্টই মনে হয় —

আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব - দুলাল ফুলের সবুর সবে ।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা শহরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত — রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, হিন্দু মুসলমান - দাঙ্গা, বৃটিশ শাসনের অত্যাচার, আলিপুরের জেলে স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা কবির মনে পড়েছে । স্বরাজ্যদলের কর্মীরা রাজরোষে পড়লে তাঁরা গ্রেপ্তার হ'লেন । সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার করা হলো । কবির কাছে আর্জেন্টাইনে এসব খবর পৌঁছুলে কবিও বিচলিত হয়ে পড়েন । কিন্তু কবি এই ভাবনাগুলো ভাবছেন একটু দূর থেকে । তাই হাল্কাভাবে একটু ব্যঙ্গচ্ছলেই পুলিশের দৌরাত্ম্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন 'চিঠি'তে । গ্রীষ্মকালে শৈলাবাসে সিমলায় বড়লাট দিন কাটাচ্ছেন অথবা দার্জিলিঙ শৈলাবাসে আছেন বড় বড় রাজপুরুষেরা । তাদের দাপটে শৈলাবাসগুলোও দারুণ উত্তপ্ত যেন । এরাই নকল শিব, কলির ভূদেব । হাল্কা সুরেও পৌরাণিক শিবের তাণ্ডব প্রসঙ্গ উত্থাপিত এখানে । কিন্তু এর মধ্যে গম্ভীর কথা যেটুকু , যা কবিকে ব্যথিত করে তোলে তা বাংলাদেশের যৌবনকে জ্বালিয়ে সারা করবার সংবাদ । 'বলাকা'র পর্ব থেকে কবির সমস্ত অন্তর জুড়ে যে যৌবন-গান ধ্বনিত তার বিনাশ কবির কাছে দুঃসহনীয় ।

(২) পূরবী থেকে পরিশেষ -

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় সমসময়ের সমাজভাবনার, রাজনৈতিক ভাবনার তেমন পরিচয় নেই, কিন্তু এই সময়েরই লেখা রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় সেই সমাজ সমস্যায় জারিত চিন্তা ভাবনা ধরা পড়েছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হারুণা - মারু জাহাজে যাবার পথে ও ফেরার পথে ক্রাকোভিয়া জাহাজে চলতে চলতে, আমেরিকায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থের পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির যে গদ্য রচনাগুলো লিখলেন তাতে প্রায় প্রতিদিনই ভারতের, বা বিশ্বের সম্পর্কে নানা ভাবনা চিন্তার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হলো। ভারতের রাজনীতির প্রসঙ্গ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনা, আমেরিকার বন্ড প্রাসনীতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত চিন্তা, ভারতে ইংরেজশাসন ও ভারতীয়দের প্রতি সরকারের ব্যবহারের প্রসঙ্গ সমাজে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই ডায়ারিগুলোতে প্রকাশিত। ইংরেজ ধনীর ভারতবাসীর রক্ত শুষে নিয়ে মুনাফা লাভের চেষ্টাকে কবি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে সমালোচনা করেছেন পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতেই, ৬১

"যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে, বলে, "এই তো পাকাচালে ভারত শাসন।"

ডায়ারিতে সাল, তারিখ দেওয়া থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাভাবনা প্রাত্যহিকতার ঘটনায় ধরা নয় – অনেকখানিই দূর থেকে অভিজ্ঞ

****

৬১। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্রাকোভিয়া জাহাজ, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, পৃষ্ঠা : ১০৩ ।

দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখা । আবার বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও যা ভেবেছেন ঠিক একই সময়ে তারও পরিচয় আছে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতেই [৩২]

"সিদ্ধি , যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্সেস্‌ , তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায় । য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্য নীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে । ...... বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্‌ নিয়ত ব্যস্ত ।"

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিদেশে গেছেন – বিদেশের রাজা - রাজনীতির চরিত্র গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন , আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঝড়ের পূর্বাভাস দেখেছেন মানসচক্ষে । দেশের ও বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র চঞ্চলতা , অন্যায় , লোভ , শঠতা , পীড়ন কবিকে রীতিমত চঞ্চল করে তুললেও কবি কিন্তু স্থির শান্ত দৃঢ় দৃষ্টিতেই এসব ভাবনা ভেবেছেন ।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরলেন ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে । এই ফিরে আসবার সময়েই স্বল্প সময়ের জন্য হলেও প্রথমবারের মত ইতালী ঘুরে এলেন । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে কবি দ্বিতীয়বার ইতালী গেলেন । ইতালী ও আরো নানা দেশে ঘুরে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ফিরলেন দেশে । এই সময়েই ৩১ - মে ও ১৩ - জুন দু'বার মুসোলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় । ইতালীর রাজার সঙ্গেও দেখা হলো তাঁর । ফ্যাসিস্ট বিরোধী বলে দার্শনিক ক্রোচে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন । কিন্তু কবির সঙ্গে তাঁর এই সময়ের যে সাক্ষাৎকার তাতে ইতালীয় রাজনীতি ,

****

৩২। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ ,
পৃষ্ঠা - ৬৬ - ৬৭

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত আলোচনার সুযোগই এলো না তাঁদের মধ্যে। ২২ জুন সুইজারল্যান্ডের ভিলেন্যুভে রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হলো। রোলাঁর সঙ্গে আলোচনায় ভারতের রাজনীতি, ইতালীতে কবির বিবৃতি, ইতালীর ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি বিষয়ও ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনার সূত্রেই প্রথম ইতালীর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলেন।

অন্যদিকে জাপান ও ইংরেজ অধিকৃত চীনের শিল্পাঞ্চলগুলোতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে - মাস থেকেই শ্রমিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। কিছুদিন পরে দক্ষিণ চীনে নিরস্ত্র ছাত্র ও শ্রমিকদের মিছিলের ওপরে বৃটিশের অত্যাচারের ঘটনায় মর্মাহত হলেন কবি। উল্লেখযোগ্য যে এই মিছিলের ওপরে গুলিবর্ষণ করেছিল ভারতীয় শিখ সৈন্য বৃটিশ অফিসারের নির্দেশে। তাই ভারতীয় সৈন্যদের এই দাস মনোবৃত্তির সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ 'শূদ্রধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন এবং চীনের গণ জাগরণকে স্বীকৃতি জানালেন [৩৩]— 'মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখর দারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এশিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে, য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণ ক্লান্ত পীড়িত এশিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্ব মহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে।'

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনে অবস্থানকালে তিনি চীনা বুদ্ধিজীবীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁরা যাতে পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত না হন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত চীনা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই পরামর্শ গ্রহণ

****

৩৩। শূদ্রধর্ম, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫৫ পৌষ, পৃঃ - ২৫৭

করা সম্ভব হয়নি । এন. হে লিখিত 'এশিয়ান আইডিয়াস অভ ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থের 'চাইনিজ ভিউজ, অভ টেগোরস্ মেসেজ ' অংশে এ সম্পর্কে জানা যায় (পৃ - ১৯০ - ৯১)-

' We cannot live without the benefits of material civilization. To neglect them would mean that all our four hundred million people would be the victims of the material civilization of other peoples. Would this not be terrible ? If these high-flown words of Tagore and other scholars are allowed to increase, like drops of water becoming a river, I am afraid our young students will be endlessly misled. '

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বক্তৃতা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ মার্চ মাসের প্রথমদিকেই ফিরলেন শান্তিনিকেতনে । কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ভয়াবহ হয়ে উঠলো । কবি বিচলিত হয়ে উঠলেন , ১৩৩৩ , বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেবের চরণে তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তর নিবেদন করলেন , হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে বুদ্ধের করুণাঘন আশীর্বাদ প্রার্থনা করে 'বুদ্ধ জন্মোৎসব' কবিতাটি লিখলেন যা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংযোজন অংশে স্থান পেয়েছে । এই সময়েই 'নটীরপূজা' নৃত্যনাট্যটিও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এখানেও প্রদর্শিত হয়েছে বুদ্ধদেবের মানবিক প্রেমের মহিমার প্রসঙ্গ । 'বুদ্ধ জন্মোৎসব' মনোযোগ সহকারে পড়লে তার মধ্যে সেদিনের হিংসোন্মত্ত পৃথিবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানস প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিতগুলি স্পষ্টভাবে ধরা দেয় —

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব .

ঘোর কুটিল পন্থ তার ,
        লোভ জটিল বন্ধ ।
ক্রন্দন নয় নিখিল হৃদয়
        তাপদহন দীপ্ত ।
বিষয়বিষ - বিকার হীন
        খিন্ন অপরিতৃপ্ত ।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি ,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি ,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ ,
        তব সুন্দর ছন্দ ।

বোঝা যায় , দেশকালের অন্যায় , যন্ত্রণা , অত্যাচারে উৎপীড়িত মানুষের গ্লানি এবং তজ্জনিত কবির ভাবনার কথা কবিতাটির পেছনে ছায়া ফেলেছে । বৈশাখের মাঝামাঝি (১৪ বৈশাখ, ১৩৩৩) শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন , [৩৪] "শুনচি কলকাতায় আজকাল রক্তবর্ষণ ছাড়া আর সব রকম বৃষ্টি বন্ধ – উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে ।' আবার ১৮ বৈশাখ, ১৩৩৩ প্রমথ চৌধুরীকে পুনরায় লিখলেন, [৩৫] "কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত আটশো মুসলমান গুণ্ডার সমাগম হয়েছিল । রক্তবৃষ্টির পূর্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে – গিরিডি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস আসাতে চাপা পড়ে গেল । রক্তমোক্ষণের পরে কলকাতার বায়ুপ্রকোপের কিছু উপশম হয়েছে শুনচি ।"

****

৩৪। চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃষ্ঠা - ১৮২ ।

৩৫। চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃষ্ঠা - ১৮৩ - ৮৪ ।

দেশের তৎকালীন ধর্মের গতি;অস্থিরতা , হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাকুল কবি শান্তিনিকেতনের এক ভাষণে [৩৬] বললেন , "বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মত মারচে । এই কি হ'ল ধর্মের চেহারা ? .... আজ তার এই মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম , খাঁটি আস্তিকতা পায় , তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে । নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্ম বিকারকে দগ্ধ করা ছাড়া , একেবারে নূতন ক'রে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে , বুঝতে তো পাচ্ছিনে ।"

কিন্তু নতুন করে আবার শুরু করতে গিয়েও কবি দেখেছেন (ধর্ম মোহ - রেলপথ , ৩১ বৈশাখ, ১৩৩৩, পরিশেষ) —

"যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া ,
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে ,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে, -
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে ।"

এই জন্যই কবির প্রার্থনা ধর্মরাজের কাছে —

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি ।
যে - পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে ,

....

৩৬। শান্তিনিকেতনের ভাষণ — প্রবাসী , ১৩৩৩ আষাঢ় ।

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো ,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো ।'
(ধর্মমোহ । রেলপথ । ৩১ বৈশাখ, ১৩৩৩।)

২৩ ডিসেম্বর , ১৯২৬ , স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যিনি অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে হিন্দু - মুসলমানের মিলনের আহ্বান প্রার্থনা করেছিলেন তিনি খুন হলেন একজন মুসলমানের হাতে । ফলে প্রবল উত্তেজনায় দেশ চঞ্চল হলো । এ ঘটনায়ও রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ দুঃখ পেয়েছিলেন । তাই দেশবাসীকে হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে মনের দুর্বলতা , দ্বিধা - দ্বন্দ্ব দূরে করে প্রকৃত ধর্মকে জয়ী করবার কাজে উৎসাহ দিলেন রবীন্দ্রনাথ । তাঁর এই ধর্ম নিঃসন্দেহে মানুষের ধর্ম – এবং তা মানবভাবনা বহির্ভূত কোন দেবদেবী কেন্দ্রিক ধর্মাচরণ নয় । এই ধর্মকে বীরের মতোই গ্রহণ করা দরকার – কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর কাছেও কবির মিনতি, –

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম, –
যুদ্ধ সংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম ।
সংকট মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে ,
যে - চরণ বাধা লঙ্ঘিবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ ।
(গৃহলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৪, পরিশেষ ।)

ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকেই দেশের সর্বত্র যুব আন্দোলন , শ্রমিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংখ্যায় অনেক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । বারদৌলিতে ভূমিকর বাড়বার ফলে প্রতিবাদ স্বরূপ কৃষক আন্দোলন ঘটে যায় – ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে , আর 'কমিউনিষ্ট পার্টি' এবং 'ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি'ও সংগঠিত হতে থাকে । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সাইমন কমিশন' বর্জনের উত্তেজনা দেখা দিলো ভারতের সর্বত্র । ৩রা ফেব্রুয়ারী

কমিশনের ভারতে আসবার দিনটিতে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ, মিছিল আর পুলিশের লাঠি - গুলি একই সঙ্গে চললো । ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর লালা লাজপৎ রায় এই পুলিশের মারেই প্রাণ হারালেন । এই বছরেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' ।

এই সময়ে ১৯২৬ - ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও চলছে । গান্ধীজীর মন্ত্র হয়ে উঠেছে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু - মুসলমানে ঐক্যস্থাপন আর ঘরে ঘরে চরকানীতি পৌঁছে দেওয়া । শাসনকার্যে একটি বিশেষ নতুন পদ্ধতি যেমন সম্প্রদায়গতভাবে মন্ত্রী নির্বাচনের উম্মাদনা দেশের কোথাও দেখা গেলো । এসব ছাড়াও আরও দেখা গেলো — ভারত সরকারের কাছ থেকে আপোষে স্বরাজলাভের চেষ্টা, তাদের শাসনকার্যে সাহায্য করা ইত্যাদিতে উৎসাহ দেখালেন গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । ইংরেজরাজের কাছে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন তথা ভারতবাসীকে কাঙালপনা করে ভিক্ষার ঝুলি ভরবার কথা রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেননি — যা এ ঘটনা মেনে নিতে পারেন নি । তাই জীবনের যে কোন ক্ষেত্রই হোক , বিশেষ করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কাজে ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতবাসীর কাঙালপনার প্রসঙ্গ তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি 'ভিক্ষু' (বাঙালোর, ১৩ জুন, ১৯২৮) কবিতাটিতে —

হায়রে ভিক্ষু , হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর ,
নিঃশেষে দে বিদায় রে ।

....

তোর সাধনায় রত্নমানিক
পথে পথে যায় ছড়ায়ে ,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস্ নে শিরে চড়ায়ে ।

——— কারণ কবির বিশ্বাস , ভিক্ষাতে শৃঙ্খলেরই জয়ই হয় । বীরের বর্ম প'রে মানবধর্মকে, মানুষের প্রাপ্য সম্মানকে জয় করে

নিতে হয় । দেশের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কাজ ভিক্ষার পথে নয় বরং দেশবাসীর পুরুষকারই আবশ্যক — দুঃসাহসী মনের উৎসাহ আবশ্যক । দেশ ও বিশ্বের জটিলতর পরিস্থিতির মধ্যে এ কথাই বার বার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ।

১৯২৮, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রগুলোতে ধর্মঘট হলো । এর পেছনে সক্রিয় ছিল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি । ফলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ থেকে সরকারের অত্যাচারীরূপ প্রকট হলো । মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো ঠিক এই সময়েই । অন্যদিকে লাহোর জেলে দীর্ঘ ৬৪ দিন অনশনে থাকবার পর বিপ্লবী যতীন দাসের ১৩ - সেপ্টেম্বর ১৯২৯ মৃত্যু হলো । তার সঙ্গে সঙ্গে দেশে আন্দোলন , বিক্ষোভ , মিছিলে মিছিলে জনতা আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিলো । সক্রিয়ভাবে এর পেছনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু — কিন্তু গান্ধীজী নন । রবীন্দ্রনাথও রীতিমত বিচলিত হয়েছিলেন ।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনে আরব ইহুদী দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা হলো । তারপর থেকে বিদ্রোহী আরবদের উপরে ইংরেজের দমননীতি আরবে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে । ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতে 'প্যালেস্টাইন দিবস পালিত হলো , আরবের মুক্তি - আন্দোলনকে ভারত সমর্থন জানালো । প্যালেস্টাইন সমস্যার মধ্যে শুধু আরব মুক্তিকেই বেছে নিয়ে যে আন্দোলন তাতে জওহরলাল ও কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও মোটামুটি ভাবে দেশের এই সমস্ত আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ খুশিই হয়েছেন ।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যান এবং দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ইংলণ্ড , ফ্রান্স , আমেরিকা , জার্মানী , রাশিয়া ইত্যাদি পরিভ্রমণ করেন। প্রবাসে থেকে বিশ্ব ও দেশীয় ইতিহাস চেতনায় এই সময়েও সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । বিশ্বের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কবি দেখলেন সারা বিশ্বে ভয়াবহ অর্থনীতিক দুর্যোগ চলছে । জার্মানীর আভ্যন্তরীণ সংকট প্রবল

হলো ও আমেরিকা জার্মানীকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করলো । ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে – জার্মানীতে হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বেকার হলো – পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো । জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্টদের বিভেদ এই দুর্যোগের সময়েও অব্যাহত রইলো । জনগণ বিভ্রান্ত হলো । ফলে এই সময় থেকেই হিটলার প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন । কয়েক বছরের মধ্যে হিটলার ক্ষমতায় এলেন । এই জার্মানী ভ্রমণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৮ আগস্ট, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লিখলেন,[৩৭] "এই যাত্রায় আগেরবারের চেয়ে জার্মানীর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে । ...... জর্মানির বিভীষিকা দুঃস্বপ্নের মনে কিছুতেই যে মুছতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি । এরা ভয়ঙ্কর একরোখা । দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়ে এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে ।"

ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে । সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই বেআইনী করলেন সরকার । লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার, জেলে বন্দীদের ওপর অত্যাচার – প্রদেশে প্রদেশে সত্যাগ্রহ অভিযানের ওপরে চলতে থাকলো এবং তা ব্যাপকভাবে । ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, ২২ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের আলিপুরের সেন্ট্রাল জেলে অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা ঘটলো । ঐ দিনেই পেশোয়ারে গণ - অভ্যুত্থান হলে তখন থেকেই সেখানে দমননীতি চললো । ৪ মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হলো । শেষ পর্যন্ত ১২ মে শোলাপুরে মার্শাল ল' শুরু হলো । রবীন্দ্রনাথ ১১ মে লন্ডনে পৌঁছলেন । ২৭ এপ্রিল সরকারের প্রেস আইন পুনরায় বলবৎ হওয়ায় ভারতের সব ঘটনা ঠিকমত বিদেশে পৌঁছতে পারছে না । রবীন্দ্রনাথ এইবারে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন ভারতের ঘটনাবলীতে । ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৪মে লন্ডনে কোয়েকারদের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন । ভারতের ইংরেজরাজের অত্যাচারকে

****

৩৭। পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৯, রবীন্দ্ররচনাবলী – দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৫০ - ৫১ ।

যেমন নিন্দা করলেন কবি তেমনি আবার ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে, গান্ধীজীর সংগ্রাম চিন্তাকে সমর্থন করলেন তাঁর ভাষণে । তবে এ - কথাও ঠিক যে বিচ্ছিন্ন জাতীয় স্বাধীনতা নয় , বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত নির্ভরতার ভিতর দিয়ে মানবজাতির পূর্ণ স্বাধীনতাকে কামনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের ক্ষেত্রে এবং বিদেশের ক্ষেত্রেও । রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভাষণটি আমেরিকার Unity পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো ।[৩৮] প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সহযোগিতাকে আহ্বান করে ভাষণের একাংশে বললেন , " Let us, the dreamers of the East and West, keep our faith firm in the life that creates and not in the machine that constructs - in the power that hides its force and blossoms in beauty, and not in the power that bares its arms and chuckles at its capacity to make itself obnoxious. Let us know that the machine is good when it helps but not so when it expolits life. "

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত কোয়েকার সম্প্রদায় ভারতের অবস্থার উন্নতির কথা ভাবতে লাগলেন গভীরভাবে । কিন্তু বৃটেনের সমর্থকরা কবির ভাষণে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কবি তাঁদের উদ্দেশে বললেন ,[৩৯]

****

৩৮। Unity - 18 August, 1930.

৩৯। The Friend, London, 30 May, 1930.

" I ask you for your co-operation and that you may realise yourselves in our place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with the blood. Will you realise we want the privilege of serving our own country in our own way and to solve our problems. Give us the right to serve our own country. "

৫ জুন বিলেতের Race Conference - এর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বিভিন্ন বর্ণ সম্মেলনের সম্বন্ধে বললেন, [৪০]
" I regard the race and colour prejudice which barricades human being against each other as the greatest evil of modern times, which should be overcome. Humanity must be realised as one in spirit. "

অন্যদিকে আবার দেশীয় চিন্তায় চঞ্চল রবীন্দ্রনাথ ভারতে গবর্মেন্টের পৈশাচিক নৃশংসতায় ক্ষুব্ধ। এবং ৭ জুন Spectator পত্রিকায় তা নিয়ে আলোচনা করলেন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও দেশবাসীর মনোবলের ওপরে আস্থা স্থাপন করলেন। বক্তব্যের শেষে এ কথাই বললেন, [৪১] "The only thing which is most important for us to remember is that we should heroically uphold our own Dharam and refuse to accept defeat by offering violence in return. "

....

৪০। The Friend - London, 13 June, 1930.

৪১। The Spectator - 7 June, 1930.

যুদ্ধ ও বিশ্বের পরিস্থিতি, বিশেষভাবে জার্মানীর অবস্থা দেখে কবিচিত্ত বিচলিত এইসময়ে । এই সময়ে জার্মানীর মিউনিখ শহরে ১৯৩০-এর ১৩ জুলাই তারিখে একরাত্রির মধ্যেই তাঁর দীর্ঘ মৌলিক কবিতা ' The Child ' লেখেন । ফিল্মের জন্য লেখা হয় এই কবিতাটি । উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ মিউনিখে যীশুর জীবনী অবলম্বিত 'প্যাশান প্লে'- র অভিনয় দেখে সেই রাত্রেই রচনাটি সম্পূর্ণ করেন । যীশুর জীবনে তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ কাতর মুখে মানবপ্রেমের অমর বাণীর কথা স্মরণে এলো কবির । ' The Child ' কবির উক্ত সময়ের মানস যন্ত্রণাকেই প্রকাশ করেছে । ' The Child'- এর অনুবাদ শিশুতীর্থে কবি দেখলেন এবং দেখালেন যে বর্তমান পৃথিবীতে —

বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ,
ওরা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্নতোরণ ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু ,
দেবতাহীন দেউলের সর্প বিবরছিদ্রিত বেদি ,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপান পঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত ।

— এবং এই যে পৃথিবীর যুদ্ধ , অশান্তির ভীষণ কোলাহল উঠছে আকাশ বাতাসকে দুর্যোগে আবৃত করে তার অন্তর্নিহিত বীভৎসতাকে কবি জানেন —

এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত —
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত ,

তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য ।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে ,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাঁদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো ।

মানুষের এই দিশেহারা উচ্ছন্নে যাওয়া এক একটি অংশ হিংসা-কণ্টকিত পথ আর পশুশক্তিকেই আদ্যাশক্তি বলে মেনে নেয় , — ভারতবর্ষে যেমন ইংরেজরাজের দমননীতি আর বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ওপরে দলননীতি । রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন ঘৃণায় , লজ্জায় , তবুও আশাপথ চেয়ে থেকে কবি ভাবেন — যদি দুর্যোগের মেঘ কেটে গেলে জনতাকে সার্থকতার তীর্থপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আর মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে তারা পথ চলে তাহলেই যুগজীবনের সর্ববিধ বাধা অতিক্রম করে উঠতে পারে । তাই কবির ভাবনায় ডাক এসে পৌঁছয় —

তরুণের দল ডাক দিন, চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে , শক্তির তীর্থে ,
হাজার কণ্ঠের ধ্বনি নির্ঝরে ঘোষিত হল —
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর ।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক ,
মৃত্যু বিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সম্বলমান ইচ্ছার বেগ ।
তারা আর পথ শুধায় না , তাদের মনে নেই সংশয় ,
চরণে নেই ক্লান্তি ।

— কিন্তু এই প্রয়াসও সম্ভব হয় না — এমন মহৎ পথে মানুষকে চালনা করবার , পথ দেখাবার উপযুক্ত বিশ্ব - আর্থী নিবেদিত মহৎ নেতৃত্ব

বিশ্বে কদাচিৎ আসে অথবা আসেই না । যদিবা আসে – তাতেও লেগে থাকে আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস অথবা লোলুপ দৃষ্টির পঙ্কিল আবিলতা । ফলে দীর্ঘজীবী হয় অত্যাচারীর অত্যাচার । জীবনের সীমাকে উত্তীর্ণ হতে পারলে, মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হতে পারলে, আপনার একান্ত ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে মানবস্বার্থকে স্থাপন করতে পারলে, সংগ্রামের পথে সর্ববাধা বিপত্তি সংশয় দুর্বলতাকে কাটিয়ে চলতে পারলে, মানবমহিমায় আস্থা স্থাপন করতে পারলে তবেই বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি, পৃথিবীর স্বার্থান্ধ মানুষগুলি বিভেদ ভুলে আপনাকে জয় করে নিতে পারবে । এই মানবপ্রেমেই যীশুর জীবন সুন্দর । এই কথাই রবীন্দ্রনাথ এবারের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদেশভ্রমণের সময় তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে তুলে ধরেছেন । পরিশেষের 'শিশুতীর্থ' কবিতায় নবজন্মতীর্থ পথে মানুষের শাশ্বতযাত্রার অভিনব ইতিহাস ভাবনায় ভাবিত হলেন কবি –

"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের" ।

কেননা নবজাতক আনে নবজীবনের সূচনার ইঙ্গিত বহন করে আর তাতে আশ্রিত হয়ে ওঠে অভিপ্রেত আদর্শেরই রূপায়ণ প্রত্যাশা ।

বিশ্বের জটিলতায়, অর্থনৈতিক সঙ্কটে মানুষের যে বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি তাকে কবি বিক্ষিপ্ত বিকারের প্রলাপ, ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট, ভগ্ন তোরণ, জীর্ণ সেতু, সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি, দীর্ণ সোপান পঙ্ক্তি, ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো, বিভীষিকার উক্তি পরানো ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন । কবিতার প্রায় সর্বত্রই অসমাপ্ত, শূন্য, অবাঞ্ছিত অবস্থার রূপটি জীবনের অসম্পূর্ণতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে । বিসর্পিত, পঙ্কস্রোত, পরস্ত্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশহাস্য, মশাল, বিভীষিকার উক্তি, প্রভৃতি রূঢ় কঠিন শব্দ ও বাক্যাংশে বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসচেতনাই প্রকাশিত । আবার যখন

কবি আদর্শচেতনা, প্রেমচেতনায় উদ্বোধিত জীবনকে — বিশুদ্ধ দেখতে চেয়েছেন পারস্পরিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তখন শব্দ, বাক্য তদনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে — সেখানে ইচ্ছা আদর্শ প্রেম সমস্ত সম্পূর্ণ — ভাষা তাই হয়ে উঠেছে সহজ মাধুর্যে মন্ডিত, তাৎপর্যে গভীর।

১৯৩০, ২৯ আগস্ট ঢাকায় মিডফোর্ড হাসপাতালে বাংলার গুপ্ত সন্ধান বিভাগের পুলিশ প্রধান, ঢাকার পুলিশ বিভাগের প্রধান এবং ৮ ডিসেম্বর মহাধিকরণে কারাবিভাগের প্রধান সিম্পসন সাহেবের উপরে আক্রমণ চালান বিপ্লবী বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। এ ছাড়া ১৮৩১, ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টীভেনস নিহত হলেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে। দুজনেই বিপ্লবী এবং স্কুলের ছাত্রী। এই রকম আরো কতকগুলি ঘটনার ফলে দেশে খুন, জখম, ধরপাকড়, ফাঁসি, কারাগৃহে অত্যাচার ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ালো।

দেশের এই সমস্ত ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং তার সমস্যাবলীও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হলো ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ। জাপানও মাঞ্চুরিয়া অভিযান করে এই সময়েই। ১৯৩২, ২৮ জানুয়ারী জাপান সাংহাই ও চাপেই অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে। লীগ অব নেশনস্ জাপানের প্রতি সহৃদয় থাকবার ফলে প্রথমদিকে এ ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান সম্পর্কে তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন তৈরি করে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩১, ১ আগস্ট থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত লিয়ঁ শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুদ্ধবিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষকে আইনস্টাইন আহ্বান জানালেন, — " I address myself to you, the delegates of the War Resisters' International, meeting in conference at Lyons, because you represent the movement most certain to end War. If you act wisely and courageously, you

can become the most effective body of men and women in the greatest of all human endeavours. Those you represent in fifty-six countries have a potential power far mightier than the sword.

I appeal to all men and women, whether they be eminent or humble, to declare before the world Disarmament conference meets at Geneva in February, that they will refuse to give any further assistance to war or the preparation of War."[৪২]

আইনস্টাইনের এই আহ্বানের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও আকর্ষণ ছিল। ১৯২৯ - ১৯৩৩, গোটা পৃথিবীতেই দেখা দিলো ব্যবসা - বাণিজ্যে মন্দা ও সঙ্কট অবস্থা। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এর হাত থেকে মুক্তি পেলো না। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কৃষির উপর এই আঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া বিশেষ করে বাংলার বস্ত্র - শিল্প, চা - শিল্প, কয়লা, পাটকল, খনিজশিল্প ইত্যাদিও অচল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়। বেকারেরা শহরে শহরে — শিল্পাঞ্চলগুলিতে গিয়ে ভীড় বাড়াতে থাকলো। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকলো। এই অচল অবস্থার সুযোগে মুনাফালোভীর দল, পুঁজিপতিরা বস্ত্র, কয়লা ইত্যাদির ব্যবসায়ে বেশ জাঁকিয়ে বসলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত 'বাঙালীর শিল্প', 'বাঙালীর ব্যবসা - বাণিজ্য' গড়ে তুলবার আন্দোলনকে সমর্থন করে 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' প্রবন্ধ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।[৪৩] তার

* *

৪২। Modern Review - October, 1931, P - 482.

৪৩। 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' - প্রবাসী - কার্তিক, ১৩৩৮

গান্ধীজীর চরকা নীতির প্রসঙ্গ তুলে লিখলেন 'চরকা' প্রবন্ধ । এই সব প্রবন্ধেও দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বরাবর ক্ষুদ্র শিল্প - ব্যবস্থার কথাই ভেবেছেন ভারতের জন্য । সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিলটি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক ১৯৩২, ১৭ আগস্ট ঘোষিত হলে দেশ বিক্ষুব্ধ হলো । এর শর্তাবলীতে মুসলমান, ইওরোপীয়, শিখ, মারাঠী, অনুন্নত হিন্দু, খ্রীস্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, শ্রমিক, মহিলা, বিভিন্ন শিল্প - সংস্থা ; জমিদার প্রভৃতি প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্যই স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থার প্রসঙ্গ ছিল । ম্যাকডোনাল্ড - এর ঘোষণায় নির্বাচনের নির্দেশও ঘোষিত হলো । দেখা গেলো গান্ধীজী শুধুমাত্র অনুন্নত হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রসঙ্গটিই তুলে নিয়ে এর বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে অনশন করবেন এমন হুমকি দিয়ে ১৮ আগস্ট ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে তা জানিয়ে রাখেন । গান্ধীজী তখন আছেন যারবেদা জেলে । এ সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — "আমি মনে করি, বর্তমানের এই ভেদনীতি মানবতার সাধারণ ভিত্তি - ভূমিকে সমূলে বিনষ্ট করবে ।"

এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট, ১৯৩২, আনন্দবাজার পত্রিকায় । সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে স্যার চিন্তামণির প্রশ্নের জবাবে মতামত দিতে গিয়ে ১৯ আগস্ট শান্তিনিকেতন থেকে যা লিখেছিলেন এই বক্তব্যটি তারই অঙ্গীভূত ।

গান্ধীজীর অনশনে উদ্বিগ্ন হলেন রবীন্দ্রনাথ । অনশনের দিনটিতে শান্তিনিকেতনেও অনশন ও প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হলো কবির নির্দেশে । এ ছাড়া কবি নিজে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন গান্ধীজীর সঙ্গে । সাক্ষাৎ হলো যারবেদা জেলে । ৩০ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরলেন কবি । ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হলো এবং সংগঠন তৈরির কাজও চলতে থাকলো । শান্তিনিকেতনও এ উদ্যোগে সাড়া দিলো । 'চন্ডালিকা' নাটকে অস্পৃশ্যতার ভেদরহিত মানব অধিকারের আদর্শকে তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ।

ভারত মিলন সমিতির সভাপতি মিঃ কার্ল হীথ্ রবীন্দ্রনাথকে একটি তারবার্তায় ভারতের পরিস্থিতি ও বৃটেন ভারতের মধ্যেকার, আপোষ ও শান্তি স্থাপনের সুচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর মত চেয়ে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজীর মুক্তি, তাঁর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সরকারের কঠোর মনোভাব গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে আসছিলেন। কবি কয়েকদিন পরেই একটি চিঠিতে গভর্ণমেন্টের উৎপাদিত ভুল ত্রুটির প্রসঙ্গ তুলে কার্ল হীথকে জানান (১৫ অক্টোবর, ১৯৩২)[৪৪]— "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রিটেনের অধিবাসীদের ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানাইতে ভারত মিলন সমিতি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। স্বাধীনতালাভে আমাদের দেশবাসীর জন্মগত অধিকার রহিয়াছে এবং ইচ্ছানুসারে জগতের যে কোন দেশ যে কোন জাতির সহিত রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বদ্ধ হইতে আমাদের স্বাধীনতা বর্তমান। - - - - - মানবহৃদয়ের চিরন্তন দাবী যদি গভর্ণমেন্ট উদারপূর্ণ চিত্তে স্বীকার করেন তাহা হইলেই ভারতে প্রকৃত শান্তি স্থাপন সম্ভব। জগতের সমক্ষে মহাত্মাজি তাঁহার ইচ্ছার সততা প্রমাণিত করিয়াছেন, গভর্ণমেন্ট ইহার প্রত্যুত্তর দিবেন কি?" গান্ধীজীর অনশন, সরকারের দমননীতি, বন্দীমুক্তি সমস্যা — ইত্যাদি খুব বড় আকার ধারণ করে ১৯৩১ - ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তাই এই সময়ের কাব্যগ্রন্থ 'বিচিত্রতা'র কোনো কোনো কবিতায় দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩১, ১৮ এপ্রিল লর্ড আরউইন বিদায় নিলে লর্ড উইলিংডন বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি দিল্লী চুক্তি অগ্রাহ্য করলেন এবং ব্যাপকভাবে অত্যাচার শুরু করলেন ভারতে। ফলে বন্দীরা কোথাও মুক্তি পেলেন না। 'বিচিত্রতা'র 'হার' কবিতাটিতে (মাঘ, ১৩৩৮) তাই শোনা যায় —

ভেবেছিলেম বন্দীরে আজ মুক্ত করা সহজ হবে,

ক্ষুদ্র বাধায় দিনে দিনে রুদ্ধ যাহা ছিল অগোচরে। এবং পড়ের মাঠে স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের পারস্পরিক বিবাদ চরমে উঠলেও, স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের শেষ পর্যন্ত হার হলেও —

* *

৪৪। কার্ল হীথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৭ অক্টোবর, ১৯৩২ এর বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত।

হঠাৎ বলে উঠল সে - যে, রুদ্ধ নয়ন তার,
পড়ের মাঠে তাদের দলের হার হয়েছে, অন্যায় সেই হার ।

কেননা তবুও তো এই যুবশক্তির ক্লান্তি নেই বার বার বৃটিশ সরকারের কাছে তারা মার খেয়েছে বার বারই পূর্ণ উদ্যমে সে মার ফিরিয়ে দেবার জন্যও সঙ্কল্প নিয়েছে । আবার যাত্রা (বিচিত্রতা, ১২ মাঘ ১৩৩৮) কবিতায় আছে —

রাজা করে রণযাত্রা,
বাজে ভেরি, বাজে করতাল,
কম্পমান বসুন্ধরা ।
* * *
পণ্যপোত
ধায় সিন্ধুপারে - পারে
বীর কীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানবকঙ্কাল - স্তূপ,
ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চূড়া তার স্বর্গ - পানে হানে অট্টহাস ।

কবিতার বক্তব্য ও ব্যবহৃত শব্দ - সম্ভারের মধ্য দিয়ে যেমন রণযাত্রা, বীর কীর্তিস্তম্ভ, মানবকঙ্কাল - স্তূপ , অট্টহাস ইত্যাদিতে — বৃটিশ শাসনের রাজপ্রতাপ, ইংরেজের লুণ্ঠিত পণ্যবোঝাই বাণিজ্যতরী — ভারতবাসীর উপর তৎকালীন ভারত-সরকারের অত্যাচার — ইত্যাদি প্রসঙ্গের আভাস পাওয়া যায় । রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'বড়ো ইংরেজ' বলেছেন তাঁরা ইংলণ্ডে বসে ভারত সরকারের অত্যাচারের পরিচয় অনেকাংশেই সঠিক পান না । কাজেই তাঁরা প্রশংসাই করেন ভারত সরকারের সুষ্ঠু ভারতশাসনের আর তাই সেই শাসকবর্গেরও বীরকীর্তিস্তম্ভ গাঁথা হয় তাদের স্বদেশের

মাটিতে । কবিতায় তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে । ১৩৩৮ এ প্রকাশিত হলো 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থ । এই বনবাণীর কবিতায় ও গানে নটরাজের আবির্ভাব পুনরায় প্রত্যক্ষীভূত হলো । নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় মুক্তি, যৌবন, চিরনবীনের যে বন্দনা গান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তা বলাকায়, শারদোৎসবে, ফাল্গুনীতে, গানে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে সর্বত্রই বারবার তুলে ধরেছেন । 'বনবাণী'র বসন্ত বন্দনায় চিরনূতন ও চিরযৌবনই আমন্ত্রিত । নবীনের সর্বক্ষেত্রে – প্রেমকল্পনায়, সৌন্দর্যধ্যানে, যৌবনচাঞ্চল্যে, বিপ্লবে, ঋতুচক্রের আবর্তনে বিবর্তনে, নিসর্গের মাধুর্যলীলায় ও তার রুদ্রতায় বার বার কবির নটরাজের লীলা প্রতীতি দেখা দিয়েছে । যে জীবন ও যৌবনধর্মের ধ্যান তাঁর অনুভবে নটরাজ পরিকল্পনায় তা প্রতীকায়িত । 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যাত্রী', 'অগ্রদূত', 'শান্ত', 'প্রণাম' এই ক'টি কবিতা যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩৩৮, ১২ চৈত্র ১৩৩৮, ১৪ চৈত্র ১৩৩৮, ও ১৭ চৈত্র ১৩৩৮ এ রচিত হয় । ১১ চৈত্র ১৩৩৮ এ লেখা হয় 'ছন্দোমাধুরী' । এই কবিতাটি অবশ্য 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে । তবু রচনা সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে একই সঙ্গে আলোচিত হলো ।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ , জানুয়ারী থেকে মার্চ — এই সময়ে সরকার সমস্ত দেশে ১৭টি অর্ডিন্যান্স জারি করে , কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বে - আইনী ঘোষণা করে , সভাসমিতি , মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দেশের প্রথম সারির নেতারা সকলেই তখন পিঞ্জরে আবদ্ধ । একদিকে চলছে দেশবাসীর উপরে পুলিশী নির্যাতন অন্যদিকে দেশবাসীর মধ্যে জেগেছে প্রবল উত্তেজনা । আন্দোলন বয়কট, পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলায় তৎপর হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশ । গান্ধীজী আছেন যারবেদা জেলে । স্যার স্যামুয়েল হোরকে ১৯৩২, ১১ মার্চ গান্ধীজী জানালেন যে যদি অনুন্নত হিন্দুদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় আর সরকার যদি তার নৃশংস দমননীতি বন্ধ না করেন তাহলে তিনি আমরণ অনশন করবেন । স্যামুয়েল হোর প্রায় একমাস পরে গান্ধীজীকে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দেন ।

এই সময়ে গান্ধীজীর অবস্থা ও তাঁর বক্তব্য ইত্যাদিকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত 'মানী', 'অগ্রদূত', 'শান্ত', 'প্রণাম', শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। আর এই সূত্র ধরে সমসময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটও আঁকা হয়েছে কবিতাগুলিতে। 'মানী' কবিতাটিতে বললেন –

উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
        তুচ্ছ ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
        মন্দিরবাসী দেবতার মতো
        সম্মান শৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছে পূজার আসনতলে।

দেশের দুরবস্থা ও শাসকবর্গের অন্যায় আচরণে মাঝে মাঝেই অভিমান জমে ওঠে গান্ধীজীর, আর তখন অনশনের পথ বেছে নেন তিনি। কঠিন তাঁর সে মূর্তি। সাধারণের থেকে অনেক উঁচুতে সে কঠিন মূর্তির বহুমূল্য মর্যাদা। গান্ধীজী পথিক – সমস্ত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করে তুরীশিকর শিখরে উঠেছেন, দেশের নানাবিধ যন্ত্রণা অপসারিত করে দেশের মুক্তির কাছে নিরন্তর এগিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই আশার আনন্দেই বিশ্বাসী। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ – হানাহানির বিরোধ চারদিক থেকে ঘনিয়ে উঠলো 'ছন্দোমাধুরী' (বীথিকা) কবিতায় —

নিঠুর লোভ জগৎ ক্ষোভে
দুর্বলেরে মারিছে চোখে,
        মথিয়া তুলে হিংসা হলাহল।
. . . .
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
        দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
                অন্যায়ের প্রলয়ানল শিখা।

চলার পথে অচল শিলার স্তূপ, নিষেধবাণী, জড়নীতির গর্জন আর তনহীন পথে তর্জনী তুলে রয়েছে সংশয়ের মোহ । দেশের ভীরুতা এবং শাসিতবর্গও ভয়ে কাতর । এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে 'অগ্রদূত' কবিতায় —

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ ।
নহে নহে নহে, এ নিষেধ বাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জন
ভীরুজন মরে ভুলে ,
তনহীন পথে সংশয় মোহ
রহে তর্জনী তুলে ।
অলস - মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে ,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে ।

--- তবু এ সব বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে নবজীবনের যে সংকট পথ সেই পথের পথিককে ও তাঁর জীবনের ব্রতকে অর্থাৎ দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তি ব্রতকে অভিনন্দিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের এই সংকটপথের পথিক কল্পনার পেছনে গান্ধীজীরই ছায়া রয়েছে । জীবনের শান্তরূপে আছে গাম্ভীর্য, অনাবিধ ঊর্ধ্ব । সংসারের বিদ্রূপবাণ তার নাগাল পায় না । সেই শান্ত মনের গহনে ধ্যানের বীণার সুর । হৃদয়ের আকাঙ্খা উঁচু পর্বতের মতো — অপরিসীম আশার প্রভাত আলোক সেই শান্ত মনের ধ্যানীচোখে । এখানেও 'শান্ত' কবিতায় রবীন্দ্র-নাথ মহাত্মাজীর কথাই বলতে চেয়েছেন । দেশের সেই সময়ের যত কিছু উত্তেজনা ও বিপ্লবের সম্মুখীন দেশবাসী গান্ধীজীকে কোনো না কোনো ভাবে শ্রদ্ধা

না করে পারেনি । দেশবাসীর সামনে যতই কঠিন কঠোর অবরোধের সৃষ্টি হোক, তাদের কণ্ঠে দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রের গান থামবে না বলেই কবির বিশ্বাস আর এর পেছনে মহাত্মাজীর অবদান কম নয় । তাই —

হে শান্ত তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান ,
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান ।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হল গত
সন্ধ্যামেঘের তিমির রন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মতো ।

প্রাণকে সর্বস্ব পণ করেই দেশকে ভালোবেসেছেন গান্ধীজী, আর এই উদ্দেশ্য সফল না হলে অনশনব্রত আমরণ চালিয়ে যাবার যে সিদ্ধান্ত তা গান্ধীজীর আচরণ । এই গান্ধীজীর মহিমার ছত্রছায়া দেশের সমস্ত মুক্তি - পাগলের দিব্য আবির্ভাব ঘটেছে সে কথাও কবি জানেন আর 'প্রণাম' কবিতায় তাই বললেন —

তব শির নত
দিক্ রেখায় অরুণের মতো ,
তারি পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময় ।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' । এই 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই পর্বে কবির মনের বিশেষ পরিভাবনার প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে ।
১৯৩১ এ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্ণ হলো । বয়স বাড়ছে যতো রবীন্দ্রনাথও যেন গভীর থেকে গভীরতর প্রবাহে মানবভাবনায় অভিস্নাত হয়ে উঠছেন । অসুস্থ

হবার ফলে কবির ১৯৩১, ২০ মে পারস্য যাওয়া স্থগিত রইলো পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ গেলেন দার্জিলিংএ। এই দার্জিলিংএ থাকবার সময়েই বক্সাবন্দী শিবিরের বন্দীরা তাঁর জন্মদিন পালন করলো এবং একটি অভিনন্দন পত্র পাঠিয়ে দিলো কবির কাছে। কবির অন্তর তাতে বিচলিত হয়ে উঠলো। 'বক্সাদুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি' (১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পরিশেষ) কবিতাটি লিখে সেই কবিতার মাধ্যমেই কবি বন্দীদের প্রত্যভিনন্দন জানালেন —

> নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
> পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।...
> ভৈরবের আনন্দেরে
> দুঃখেতে জিনিল কে রে,
> বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

এই বন্দীদের প্রসঙ্গে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার স্বরূপ ও সরকারের নীতির কথা স্বভাবতই মনে হয়। ১৯৩১, ৫ মার্চ 'গান্ধী আরউইন চুক্তি' বা 'দিল্লী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে তাতে বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত অংশটিতে সরকার শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার কথাই বললেন। ফলে দেখা গেলো বক্সা, দেউলী ও হিজলী জেলের বন্দীরা মুক্তি পেলো না বরং জেলের মধ্যে তাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকলো। ভগৎ সিং, সুকদেও রাজগুরুর ফাঁসি হলো। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরাও কেউ মুক্তি পেলো না। বন্দীদের নিদারুণ যন্ত্রণা কবির অন্তর বিদ্ধ করেছে বারংবার। ১৯৩১, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিংএ বসে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠবার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত যে কোনো মানুষের রিপু যখন রীতিমতভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন সে নিজে মরবে জেনেও অন্যকে আঘাত করে — আত্মীয়কেও

বিনাশ করে । হিন্দু মুসলমানের মধ্যেকার পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তার ফলে আসলে শত্রুগ্রহ অর্থাৎ ইংরেজেরই হবে জয় । এই পারস্পরিক বিদ্বেষই কবির দুঃখতার কারণ । দার্জিলিঙ্ থেকে ২১ অক্টোবর , ১৯৩১ হেমন্তবালাদেবীকে কবি লিখছেন —

"আমি যাকে পূজা বলি, সে কঠিন কর্ম্মে, সত্যের
সাধনায় । . . . আমার মনের মানুষ কোনো
ব্যক্তিবিশেষ নন এ কথা নিশ্চয় জেনো । তাঁর
আভাস পেয়েছি ইতিহাসে মহাপুরুষদের মধ্যে ।
যেমন ভগবান বুদ্ধ ।"

কেননা এ কথা কবি জানেন যে ভগবান বুদ্ধ আত্মদান করেছিলেন বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য । হেমন্তবালাদেবী উক্ত চিঠিটি লেখার তিনদিন পরেই দার্জিলিঙে থাকতেই 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাটি লিখলেন সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এ ছাড়া এই উপলক্ষ্য মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন সারনাথে ১৯৩১, ১১ নভেম্বর । একদিন বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে তাঁর দেশ - বিশ্ব যেভাবে ধন্য হয়েছিলো আজও দেশের ও বিশ্বের জটিল দুর্যোগের দিনে সেই মহাবুদ্ধের নাম ধ্বনিত হোক --- মোহ দুশ্চিন্ত দূর হোক, বিশ্বের মাটিতে প্রেম নেমে আসুক --- শান্তি নেমে আসুক রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনাই শোনা যায় 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাটিতে (২৪ অক্টোবর, ১৯৩১) ---

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান ।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান ।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে, আজি তব নব আগমনী,

অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি —
এনে দিক অজেয় আহ্বান ।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ৩০ অকটোবর প্রকাশিত হিজলী জেলে গুলি চালনার ব্যাপারে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কারারক্ষীদের দোষ অনেক বেশী আর গুলি চালনারও কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না বলে জানা যায় ।

অন্যদিকে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা খুনী কারারক্ষীদের প্রতি "ধৃষ্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা" করায় রবীন্দ্রনাথের তা অসহ্য বোধ হয় । এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ছাপলো না কিন্তু আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার প্রকাশ করলো । এর বাংলা তর্জমা প্রবাসীর জন্য প্রেরিত হলো আর তাতে কবির বক্তব্য হলো [৪৫]---

"অথচ এ কথাও ইতিহাস - বিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ ক'রে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ত-তার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয়নি । কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না । . . . . . পরিশেষে আমি বিশেষভাবে গবর্মেন্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক ।" . . . . . এর পরেই ১৩৩৮, ১৬ই পৌষ রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করলেন হিজলী জেলের রাজবন্দীরা এবং অভিনন্দন পত্রও পাঠিয়ে দিলেন কবির কাছে । তাতে তাঁরা লিখলেন —

* *

৪৫। হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

"বন্ধন - বিমুদ্ধ অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি, হে দরদী, তোমার জন্মদিনে আজ তোমার কল্যাণ কামনা করি ..." উত্তরে রবীন্দ্রনাথও একটি প্রত্যভিনন্দন বন্দীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন (১৯৩২, ২২ জানুয়ারী) ।

১৯৩১, জুনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো , হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত পি, ই, এন্ সম্মেলনের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার প্রদর্শনের আবেদন বাণীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর করেছিলেন । দেখা যায়, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে আটক বন্দী তরুণদের কথা গভীর-ভাবে ভাবছেন — তাদের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করছেন । আর এই যুবকদলের কঠিন দুঃখবরণের মধ্যে যে ত্যাগ, পৌরুষ ও যৌবনদীপ্তি আছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ।

'পরিত্রাণ'ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকদুটির মধ্যে বন্দীদের বন্ধনদশা ও বন্ধন স্বেচ্ছাবরণের গৌরব ও আনন্দের কথাই বলেছেন । আর দেশের মাটির বুকে প্রেতহীন হিংসা ও প্রতি - হিংসার তাণ্ডব নৃত্য দেখে অস্থির হয়ে উঠে লিখলেন কবিতা —

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে ,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ।

তাই কবির অন্তর হয়ে ওঠে বিষাদময় আর কবির জিজ্ঞাসা ভগবানের কাছে —
('প্রশ্ন' কবিতা)

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে —
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কী তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।
(প্রশ্ন, পরিশেষ, পৌষ, ১৩৩৮)

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'স্পাই' (৩ আষাঢ়, ১৩৩৯) কবিতাটিতে গুপ্তচরবৃত্তির দ্বারা দেশের শত্রুতা সাধন করে যারা তাদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত —

আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়,
ঘৃণা করব, — কেন করব ভয়।

কিন্তু আবার সে যদি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয় এবং যখন সে তার আসল পরিচয়টিকে প্রকাশ করে ফেলে যায় তখন সমবেদনায় কবির অন্তর ভারী হয়ে ওঠে। কবি তখন জানতে পারেন —

উপোস করে যারা গেল সোনার টুকরো ফেলে
নন্ - ভায়োলেন্স প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।
(— স্পাই)

এমনি অনেক ঘটনার বলি হয়েছে বাংলার তরুণদল । এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবিরও দেশের প্রতি অনুরাগ, দেশের জন্য উৎসর্গিত তরুণ প্রাণের প্রতি অনুরাগ । ভয়কে , বাধাকে এমনকি মৃত্যুকেও পায়ে দলে দলে চলে — এই তারুণ্য । এই বিশ্বাসে ভর করে তিনি লেখেন —

যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও ।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে ।
(– মৃত্যুঞ্জয়, পরিশেষ, ১৭ আষাঢ়, ১৩৩৯)

দেশের তরুণ সম্প্রদায় দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে, অকাতরে প্রাণ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠেছে । এই সব দুঃসাহসী প্রাণের কথাই যেন কবি বলতে চেয়েছেন এখানে তার এই ভাবনার রঙে কবির আপন মতোপলব্ধি মিশে রয়েছে ।

ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গদ্বারে
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে ।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া ।
আগামীকালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয় ।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, তারাতুর সংশয়ের দ্বারে ।
(– প্রবোধ, পরিশেষ, ১৮ আষাঢ়, ১৩৩৯)

এই দুঃসাহসী যৌবন - উৎসাহ শিশুর, বালক - বালিকার, নারীর, যুবকের মধ্যে এবং জীবনের সর্বত্রই কবির একান্ত কাম্য । স্বদেশের জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সেই সব যুবকবৃন্দ, যাঁরা সমাজের অন্ধকার কুসংস্কার দূর করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন, দেশের ও দশের সর্ববিধ মুক্তি কামনায় যাঁরা বিপদকে বরণ করে নিয়েছেন তাঁদের প্রসঙ্গই ধরা পড়েছে উক্ত কবিতাংশে । নির্ভীক বীরদল যে দেশের মুক্তির জন্য সাগ্রহে পায়ে শৃঙ্খল পরে কারাগারের যন্ত্রণা বরণ করে নিয়ে-ছেন — এ ঘটনা বিশ শতকের চারের দশক জুড়েই ঘটেছে । নারীরাও বিপ্লবী তরুণদের শক্তি সাহস জুগিয়েছেন, তাঁরাও বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন । এই সাহসিকতাকেই রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে । 'বলাকা' রচনার পর্ব থেকেই যখন দেশ ও বিশ্ব জটিলতর পথে চলতে শুরু করেছে তখন থেকেই কবি দুঃসাহসকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন, — ঘৃণা করেছেন ভীরুতাকে ।

কবি রবীন্দ্রনাথের মন ব্যথায় বিবশ কেননা তিনি জানেন —

মানুষের জীবনের সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়
যে দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শতধায় লজ্জায় ,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে । (— সান্ত্বনা, ১৭ জুলাই, ১৯৩২)

কবির এ ধরণের ভাবনার পেছনে তৎকালীন যুগজীবনের যন্ত্রণা যা দেশের মুক্তি-সংগ্রাম, ইংরেজ শাসনের অত্যাচার, সমাজের নানাবিধ কু সংস্কার, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে হানাহানি, ঈর্ষা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত — এ সমস্তই কাজ করেছে নিঃসন্দেহে । বলেছেন কবি এই 'সান্ত্বনা' কবিতাতেই —

কে বন্ধু রয়েছে কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার —

যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর
মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।

বৃটিশ শাসনের অত্যাচার পুঞ্জীভূত হচ্ছে কারাগারে আবদ্ধ স্বদেশপ্রেমিকদের উপরে, লোভীর বঞ্চনাও পুঞ্জীভূত হচ্ছে সমাজের নানাক্ষেত্রে — দেশের মুনাফালোভীদের মধ্যে প্রবলের মধ্যে। ফলে সত্য লাঞ্ছিত সর্বত্র। তার সত্যের বিকারের উপরে কবি আপন অন্তরের নির্মম বর্জনশক্তিই ঢেলে দিলেন। কবির অন্তর যে দেশ ও বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত যা উক্ত কবিতাংশে ধরা পড়েছে, — তার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েক দিন আগে হেমন্তবালাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে[৪৬] —

"দুরবস্থাগ্রস্ত শরীর মন নিয়ে কর্ম্ম - সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করি কিন্তু কর্ম্ম বেড়েই চলে। ... সম্প্রতি নবজাগ্রত পারস্য ও আরবকে দেখে এসেছি, পূর্বে দেখেছি জাপানকে, তারা ধর্ম্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েছে — হতভাগ্য ভারতবর্ষ এই মোহের মুখের কুহেলিকায় আবৃত — সে অন্ধ, সে পঙ্গু, সে আপনার দেবতাকে নিয়ে খেলা করবে সেই অপরাধে দেবতা তাকে সকল প্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, অপমানের তার অন্ত নেই। .... কঠিন দুঃখের দিন এসেছে কিন্তু নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইনে — কণ্টকিত পথের উপর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের লক্ষ্য অভিমুখে চলতে হবে। ....

৪৬। হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি, ১৯৩২, ২২ জুলাই (১৩৩৯, ৬ শ্রাবণ)
চিঠিপত্র খণ্ড - ৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী - ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ১৫০

মনকে এক একবার বোঝাতে চাই, কর্ম আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে কাব্য । কিন্তু মন যে বোকা নয়, তাকে কথায় ভোলানো শক্ত । অতএব শেষ পর্যন্তই আছে খাটুনি ।"

রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি রাষ্ট্রনেতা নন — তিনি কবি । কিন্তু তিনি মানবদরদী কবি । তাই দেখা যায় কর্মের পথে বারবার তাঁকে নেমে আসতে । কর্মী আর কবি এক হয়ে গেছে । কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কর্মসাধনার ধারা । পরবর্তী অধ্যায়ে তাই লক্ষ করা যাবে ।

(খ) নারী মুক্তি প্রসঙ্গ -

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে দেখা গেলো ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ব্যাপারে এবং সামাজিক জীবনে অশান্তি ক্রমবর্ধমান। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম, সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপ, হিন্দু মুসলমান - দাঙ্গা, গান্ধীজীর অনশন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকলো। আর অন্যদিক থেকে ভারতবাসীর উপরে নেমে আসতে থাকে অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড মার। আবার অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নানা বিভাগ, এবং নেতাদের মধ্যে মত বিরোধ ঘটতে থাকলো। এসব ঘটনায় প্রভাব প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের মনেও ছায়া ফেলে যায়। এই পর্বের প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, বক্তৃতায় তাঁর সেই মনের প্রকাশকে তিনি তুলে ধরেছেন। সমাজের এইসব বৃহত্তর ক্ষেত্রের স্পর্শ সাংসারিক জীবনেও প্রভাব ফেলেছে দেখা যায়। তাই ক্রমে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নারীর অধিকারের প্রশ্নটিও উঠলো। আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূত্রে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন দেখা দিতে থাকলো। সেখানেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের প্রশ্নটি নারীপুরুষ দু'য়ের ক্ষেত্রেই বড়ো হ'য়ে উঠলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই নারীর অধিকার, নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গ সমাজের কিছু কিছু প্রগতিশীল হৃদয়কে স্পর্শ যেমন করেছে তেমনি তাঁরা এসব ব্যাপারে নিজেদের সক্রিয় চেষ্টা চালিয়ে গেছেন — সমাজকে নতুন পদক্ষেপের পথে পথ নির্দেশ করেছেন। এই পর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ নিরোধ, স্ত্রী শিক্ষা প্রচার, এক কথায় সমাজ - সংস্কারস্পৃহা নিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে একা লড়াই করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ আইন'— পাশ হ'য়ে যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন বিধবার সঙ্গে। কিন্তু সমাজের বুকে অতি ধীরে ধীরে এই সব প্রচেষ্টার

মুক্ত হ'তে থাকলো । বয়সে কিছু ছোটো হলেও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮ - ১৮৯৪) বিদ্যাসাগরেরই সমসাময়িক । 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) দুটি উপন্যাসে বিধবা নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ এঁকে দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র । বিধবা রোহিনী ও গোবিন্দলালের সম্পর্ক অবৈধ, কিন্তু বিধবা কুন্দ ও নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ককে বৈধ করে দেখালেও শেষ পর্যন্ত দুই বালবিধবারই মৃত্যু ঘটালেন বঙ্কিমচন্দ্র । যদিও আর্টের খাতিরেই দুটি ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটানো হ'য়েছে তবু একথাও ঠিক যে বিধবা বিবাহের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন । রমেশ চন্দ্র দত্ত 'সংসার' (১৮৮৬) উপন্যাসে বিধবা বিবাহ আর 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করে কাহিনী গড়লেন । সমাজও সময়ের বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) সমাজনীতির প্রশ্ন না তুলে বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের স্বাভাবিকতা দেখালেন । আবার শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' (১৯২৮) বালবিধবা রমার চিত্তেও আছে রমেশের প্রতি আকর্ষণ ও তার তীব্র চিত্তবিক্ষোভের স্বাক্ষর । কিন্তু বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার দীর্ঘকাল পরেও এই নারীরা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের যুগেও আপন সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলো না । বঙ্কিম উপন্যাসের বালবিধবার মত এদের মৃত্যু না হ'লেও তাদের জন্য যোগ্যমুক্ত কাশীবাসের ব্যবস্থা হ'লো । প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের মতো নাটকের ভেতর দিয়েও সমাজের নানাবিধ সমস্যা, কু সংস্কার দূর করবার আগ্রহ দেখা গিয়েছিলো এই সময়ে । বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'বিধবা - বিবাহ' নাটকে (১৮৫৬) নারীজীবনের ট্র্যাজেডি দূর করতে বিধবা বিবাহকে জোরালো যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে যথেষ্ট সাহস ও মানসিক উদারতার পরিচয় দিলেন ।

বাংলাদেশে যে নারী আন্দোলনের সূচনা হ'লো তাতে বিদ্যাসাগর, বেথুন প্রভৃতির পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির ভূমিকাও কম ছিল না । জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পর্দার অবরোধ ভেদ করে বাইরে বেরিয়েছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্যোগে ১৮৮৪-তে

মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিলো । পরে বিশ শতকের গোড়ায় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী সরোজনলিনী দেবী বিভিন্ন জায়গায় মহিলা সমিতি তৈরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হ'লো তার মধ্যে স্ত্রী লোকদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে । এই নারী বিভাগীয় শাখার ১৯০৯ ও ১৯১০ - এ এলাহাবাদে যে কনফারেন্স হয় — তাতে স্ত্রীলোকদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় । এই কনফারেন্সের সেক্রেটারী ছিলেন সরলা দেবী । লক্ষ্য করা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার, তাদের স্বাধীনতার অনেকটা প্রসার ঘটে । বহু বিবাহের মতো কুপ্রথা এই সময়ে বিনা আইনেই প্রায় বন্ধ হ'য়ে আসছিল । বাল্যবিবাহ প্রথাও অনেকাংশে লোপ পেতে থাকে । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় থেকেই ছেলে-দের মতো মেয়েদেরও বিবাহের বয়সের নিম্নসীমা ১৪।১৫ করা হ'য়েছিল । সমাজে চিরকুমারের মতো চিরকুমারীদেরও সংখ্যায় বেশী না হ'লেও দেখা পাওয়া যাচ্ছে এই সময় । পুরুষদের মতো নারীরা অবাধে বিলাতযাত্রা বা সমুদ্র-যাত্রা করেছে এই সময় থেকেই । এ ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই অসবর্ণ বিবাহও অনুষ্ঠিত হ'য়েছে আর এই সূত্রেই অস্পৃশ্যতাবোধ, বিভিন্ন বর্ণের একসঙ্গে বসে আহারের দৃষ্টান্তও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায় ।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে সমাজের কয়েকজন নারীর দুঃখ - কষ্ট ও তাদের বৈধব্য - যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকেই তিনি অন্তরের স্নেহ - আকর্ষণ বিলিয়ে গেছেন । পূর্ববঙ্গের এক বিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা কবিকে 'বাবা' সম্বোধন করতেন আর কবির কাছে আশ্রয়ও পেয়ে-ছিলেন । গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবীর কন্যা সুকুমারী বিধবা হলে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন । প্রাণ গোপাল দত্তের স্ত্রী ও মহিমচন্দ্র সরকার

মহাশয়ের কন্যা কাদম্বিনী দেবী বিয়ের অল্পকালের মধ্যেই বিধবা হন। তিনিও রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভে ধন্য হ'য়েছেন। দীর্ঘকাল উভয়ের মধ্যে পত্রের যোগাযোগ ছিল। কাদম্বিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ সান্ত্বনা জানিয়ে লিখেছিলেন, "মনের মধ্যে অবসাদ আসিতে দিয়ো না।" [৪৭]

আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী সরলাবালা সরকারের কন্যা নির্ঝরিণীর প্রতিও নানা সান্ত্বনাবাণী পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠির মধ্যে। নির্ঝরিণীকে তাঁর সংসারের নানাবিধ গোলমালের মধ্যে যখন দিন কাটাতে হ'য়েছিল সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরিণী দেবীকে লিখেছিলেন, [৪৮] "মা, সংসারের নানা গোলমালের মাঝখানে মনকে শান্ত ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত শক্ত সে কি আমি জানি নে? বিশেষত মেয়েদের সর্বদাই অত্যন্ত ছোটখাট খুঁটিনাটির মধ্যেই দিন কাটাতে হয় — মনকে উদার ভাবের ক্ষেত্রে রাখবার উপায় ও অবকাশ মেয়েদের নেই। কিন্তু কি করবে মা? যা কঠিন তাই সাধন করতে হবে।" এই নির্ঝরিণী দেবী দীর্ঘকাল পরে স্বামীগৃহে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ খুশি হ'য়ে কাদম্বিনী দেবীকে লিখেছিলেন, [৪৯] "নির্ঝরিণী আবার স্বামীগৃহে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তাহাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানাইয়ো।"

****

৪৭। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৮ জুন ১৯১১, চিঠিপত্র - সপ্তম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা - ৩৯

৪৮। নির্ঝরিণী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি — চিঠিপত্র সপ্তম খণ্ড, ১৩৬৭ ৬ আগস্ট, ১৯১০, পৃষ্ঠা - ১৫৬

৪৯। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি — ১৮ মে, ১৯১৮, চিঠিপত্র - সপ্তম খণ্ড, ১৩৬৭ পৃষ্ঠা - ৯৩

এই রকম বাংলাদেশের অনেক 'নির্ঝরিণী'র কুশল সংবাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারীদের সর্ববিধ উন্নতির কথা ভেবেছেন কবি। উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র মেয়েদের দিয়ে তিনি 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করালেন (জুলাই, ১৯১০)। কিন্তু তখনও পর্দা প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকবার ফলে কোনো পুরুষ দর্শক সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পাননি। এই বছরেই (১৯১০, ২৭ জানুয়ারী) রবীন্দ্র পরিবারে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটালেন, গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমার সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন। এই বিয়ে নির্বিঘ্নে হ'য়ে যাবার পর কনিষ্ঠ জামাতাকে লিখেছিলেন, [৫০] "রথীর বিবাহে অনেক আঘাত ও ব্যাঘাত সহ্য করতে হবে বলে মনকে প্রস্তুত করেছিলুম কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে শুভকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। তুমি ফিরে এসে বৌমাকে দেখতে পাবে এবং দেখলে খুশি হবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিয়ে দিলেন একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গেই।

নারীর স্বাধীনতা, নারী জাগরণের বিষয়টি এই সমস্ত সূত্র ধরেই গভীরভাবে রবীন্দ্রভাবনাকে নাড়া দিয়েছে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বসু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'স্পেশাল ম্যারেজ বিল' – এর উপস্থাপনা করেছিলেন। এতে বলা হ'য়েছিল যে আপন আপন ইচ্ছেমতো যে কোনো হিন্দু প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রচলিত ধর্মীয়নীতি ইত্যাদিকে বাদ দিয়েও বিবাহ করতে পারবে। তবে এই বিবাহ রেজেস্ট্রী করতে হবে। বিয়ের উপযুক্ত ছেলের ও মেয়ের বিয়ের বয়স কম করে যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ হতেই হবে। পুরুষ একের বেশী বিয়ে করতে পারবে না – আইনত তা হবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বিলটি কেন্দ্রীয়

****

৫০। কনিষ্ঠ জামাতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৩০ ফাল্গুন, ১৩১৬, দেশ, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হতে পারেনি বিরোধী পক্ষ প্রবল হওয়ায় । বিঠলভাই প্যাটেল ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে 'অসবর্ণ বিবাহ' সিদ্ধ করবার জন্য আইনের প্রস্তাব রাখেন বিধানসভায় । কিন্তু তাও কার্যকরী হয়নি । প্যাটেলের 'অন্তরবর্ণ বিবাহ বিল সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮, ডিসেম্বর - ১৯, খোলা চিঠি লেখেন । ফলে মাদ্রাজে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কবির বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা দেখা গেলো । অতিরিক্ত বরপণ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শোনা যায় যে, বিয়েতে বরপণ দিতে স্নেহলতা নামে এক কন্যার পিতাকে নিজের বসবাসের বাড়িটি পর্যন্ত দিয়ে টাকা জোগাড় করতে হ'য়েছে শুনে কন্যা স্নেহলতা ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে শাড়ীতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে । ঘটনাটি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলো । ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উইমেন্স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠান নারী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলো । নারীর অধিকারের প্রসঙ্গটি স্ত্রী-লোকের ভোটাধিকারের দাবী নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত হ'লো ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের তৈরি করা বিলে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের জন্য । ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনের বলে বাঙালি নারীদের বাংলার বিধান সভার নির্বাচনে ভোটাধিকার, সদস্যপদের প্রার্থী হবার অধিকার, ইত্যাদি প্রস্তাব ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে বিধানসভায় গৃহীত হয় । ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতের নারীরা এই অধিকার লাভ করেন । তার আগে এই সমস্ত অধিকারের দাবীতে কিছু সংখ্যক মহিলা সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভারতসচিব মন্টেগুর কাছে এক ডেপুটেশন নিয়ে যান (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৭) । এই ডেপু-টেশনে নারীরা তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার , পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে দাবী জানান ।

স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে । সরোজিনী বসু, চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ,

সরোজিনী নাইডু , কমলা চট্টোপাধ্যায় , লতিকা ঘোষ প্রমুখ অনেকেই দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে পুরুষদের সমকক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন কমলা চট্টোপাধ্যায় । লতিকা ঘোষ 'মহিলা রাষ্ট্রসংঘ' প্রতিষ্ঠা করলেন । ঊর্মিলা দেবী ছিলেন 'নারী সত্যাগ্রহ কমিটি'র প্রতিষ্ঠাতা । অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (১৯২৬) নারী মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো । অন্যদিকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, জ্যোতিকণা দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার, পারুল মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী দেবী এঁরা দেখা দিয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারিনীরূপে ।

নারীদের বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে দেখা যায় ক্রমশ তাদের উন্নতির জন্য আইন পাশ হতে থাকে । এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আইন হ'লো ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট এ্যাক্ট । সর্দা আইনে মেয়েদের বিবাহের বয়স কমপক্ষে ১৪ করা হ'লো । আর এই আইনের ফলে বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ প্রথাও প্রায় লোপ পেতে থাকলো । স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও যে হতে থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩২- ১৯৩৭ এর পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে । ১৯৩১ - ১৯৩২ এ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৩, ৫৯, ৭১২ আর পাঁচ বছর পরে এই সংখ্যাই ৭, ৩৩, ৩৮৯ - এ গিয়ে পৌঁছয় ।

স্ত্রী শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল গভীর । তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার জন্য যেমন সচেষ্ট ছিলেন তেমনি কন্যা বেলা দেবী, মীরা দেবী ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন । তিনি ইংরেজ মহিলা মিস বুর্ডেটকে মীরা দেবী ও প্রতিমা দেবীর শিক্ষার জন্য এক সময় নিযুক্ত করেছিলেন । মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার দিকেও কবি দৃষ্টি রেখেছিলেন । প্রতিমাদেবী ও মীরা দেবীকে দূরবীণের সাহায্যে চন্দ্র ও

পুরুষদের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে কবির সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায় । 'সবুজপত্রে'র যুগে দেখা গেছে বাংলাদেশের নারীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা গভীরতর হ'য়েছে । স্ত্রীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ গল্প প্রকাশিত হয় সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় । লীলা মিত্র স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনের নানাবিধ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের সামনে তুলে ধরলে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটির মধ্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন ।[৫১] সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ বিশেষ-ভাবে 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাপানে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, — তখন জাপানী মেয়েদের সাফল্যে, তাদের অগ্রগতিতে আনন্দিত হ'য়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন,[৫২] "তিন চার দিনের জন্যে এখানে একটি মেয়ে ইস্কুলের আতিথ্য ভোগ করে এসেছি । আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে । জাপানী মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েছে । আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি । আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল খুলব ।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনে মেয়েদের লেখাপড়ার আয়োজন করলেন রবীন্দ্রনাথ । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেয়েদের জন্য বোর্ডিং খোলা হ'লে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো । উৎসাহিত হয়ে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছুক রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে হেমবালা সেনকে লিখেছিলেন, (২৮ অক্টোবর, ১৯৩০),[৫৩] "ছিতরে ছিতরে কেবল একটি মাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে

* *

৫১। স্ত্রী শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী - একাদশ খণ্ড, জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৬৩২ ।

৫২। চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা - ৫০

৫৩। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৮ ।

প্রতিজ্ঞা করেছিল । মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সঙ্কল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে । যদি যথেষ্ট দক্ষিণা জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে আমার শেষ দান দিয়ে যাব বিদ্যাদান । দেশের মেয়েদের আমি বরাবর ভালবেসেছি, বোধ হয় তাদের কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন ।"

স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের প্রশ্নই শুধু নয়, সমস্ত রকমের কু সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে নারীকে সমাজে তাঁর স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার প্রায় সূচনাকাল থেকেই পরিলক্ষিত হ'য়েছে । দ্বিতীয়বারে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত গিয়ে সেখানকার সমাজের নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ তার বিলাত থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,[৫৪] "মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায় ।"

এই বিষয়টি নিয়েই অতঃপর শুরু হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তর্কযুদ্ধ । এটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর সাহিত্যিক আসরের প্রথম মসীযুদ্ধ । উক্ত চিঠিটির উত্তরে 'ভারতী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করে বললেন,[৫৫] — 'স্ত্রী - স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত । ... শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম । কিন্তু তাহা তো নহে ...' ।

****

৫৪। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, ষষ্ঠ পত্র, 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত, রবীন্দ্ররচনাবলী দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ - ২৮২

৫৫। ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পত্রের প্রত্যুত্তর, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ২৮৬

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপন ভাবনায় অটল রইলেন। নারীর উপর পুরুষশাসিত সমাজের অত্যাচার উৎপীড়নকে রবীন্দ্রনাথ নারীর বন্ধনদশা বলেই মেনেছেন এবং তাদের সামাজিক মুক্তির সপক্ষে তাঁর লেখনীকে শেষ পর্যন্ত সচল রেখেছেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বাদ প্রতিবাদ হয়েছিল এবং যার মাত্র দেড়মাসের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়।[৫৬]

এই সব বাদ প্রতিবাদ থেকে এ কথাই মনে হয় যে সামাজিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সমস্যাকেই অপক্ষপাত দৃষ্টিতে যুক্তিবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেছেন। সমাজ তার আচার প্রথা সংস্কারের পীড়নে যেখানেই জীবনের অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে উদ্যত সেখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। অত্যাচারী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাতেও দ্বিধান্বিত হননি। বন্ধু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ সম্পর্কে কবি দুটি চিঠি লিখলেন।[৫৭] ৬ অগ্রহায়ণ (১৩১৭) কবি তাঁকে লিখলেন, —

"যে সমাজ সমাজের আশ্রিতবর্গকে সর্বপ্রকারে পীড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না সেই সমাজকে মানিয়া চলাই অপরাধ।"

এই চিঠির কিছুদিন পরেই আর একটি চিঠিতে (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) কবি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার লিখলেন, —

* *

৫৬। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন — "বাল্য বিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার বাদ প্রতিবাদ হয়।"

—'সাহিত্য', চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০০।

৫৭। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, স্মৃতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮১ ও ৮৩।

"আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিসটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে । . . . . সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে – তুমি যা খুসি তাই কর — তখন সমাজ ভাল মানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে । "

রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকবছর আগেই এই সমাজ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন ,[৫৮] --

"এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই — সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পূণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে । সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক ।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ তো আছেই, সে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই ।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে । এইখানেই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দু সভ্যতাকে জিনিয়াছে । "

রবীন্দ্রদৃষ্টি মূলত মানবিক দৃষ্টি । মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তিই সেই দৃষ্টির লক্ষ্য । যেখানেই তার প্রতিবন্ধকতা, যেখানেই ব্যত্যয় ও বিপর্যয় , — রবীন্দ্রনাথ সেখানেই তার বিরুদ্ধতা করেছেন । যে মানবসমাজের মুক্তি তাঁর কাম্য সেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীও বিদ্যমান । নারীর মুক্তি না ঘটলে অসম্পূর্ণ

* *

৫৮। ভারতবর্ষীয় সমাজ (১৩০৮ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৬৮১

থেকে যায় এই মুক্তির সাধনা। কাজেই নারীর মুক্তিভাবনা রবীন্দ্রচিন্তার অনেকখানি অংশ জুড়ে অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে নারীমুক্তি প্রসঙ্গ রবীন্দ্র কবিতায় কীভাবে ধরা দিয়েছে অতঃপর সেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্র কবিতায় সমাজমনস্কতার যে নতুন প্রবাহ সঞ্চারিত, পলাতকার কবিতায় তা নারী জীবনের বিচিত্র সমস্যাকে অবলম্বন করে মুক্তি পায়।

নারীমুক্তির নানা প্রসঙ্গ 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থটি জুড়ে প্রধান বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে অন্যত্র শুধু নারীই একমাত্র বিষয় নয় — সেখানে নারীও যেমন আছে তেমনি তার পাশাপাশি আরও নানা বিষয় ও নানা ভাবনা চিন্তা সম্বলিত কবিতাও আছে। কিন্তু পলাতকার বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সব কবিতাতে নারীই প্রধান আশ্রয়। সামাজিক, পারিবারিক ও সাময়িক পরাক্রান্ত নানা প্রতিকূলতা প্রচণ্ডভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পলাতকার নারীসমাজের সামনে। আর এই ষড়যন্ত্রের পীড়নে ওষ্ঠাগতপ্রাণ তারা। স্বদেশের সমাজ সংসারের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন পলাতকার কথিকাধর্মী কবিতাগুলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে সমাজ সংসারের কুসংস্কারগুলো যেমন বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, পর্দাপ্রথা, নারীদের পরাধীনতার বিচিত্র নাগপাশ — নারীকে সমাজে উপেক্ষিতা, নির্যাতিতা করে রেখেছে। এই নারীদের জন্য কবির সমবেদনা আর প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কার প্রকাশিত হয়েছে। নারীর বিবাহ সমস্যা ও কৈশোর বিবাহের প্রসঙ্গ 'চিরদিনের দাগা', 'কালো মেয়ে' কবিতায়, স্বামী - পরিবারে নানাভাবে উপেক্ষিতা নারীর যন্ত্রণা 'মুক্তি', 'ফাঁকি' কবিতায়, স্বামী সুখবঞ্চিতা নারীর পরগৃহে লাঞ্ছনার প্রসঙ্গ 'মায়ের সম্মান' কবিতায় আর কৌলিন্যপ্রথা ও নারীর বৈধব্য লাঞ্ছনার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে 'নিষ্কৃতি' কবিতাটিতে।

'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শক্তির সঙ্গে শক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রসঙ্গটি উপমা হিসেবে রেখে বলেছিলেন, [৫৯] "স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে – তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই – ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই।"

আবার একই নারীর সধবা ও বিধবা অবস্থার মধ্যে তার সাংসারিক সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য ঘটে যায়। সংসারে নারীর এ যেন অবস্থাটিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটির এক জায়গায় বলেছেন, [৬০] "এক সময়ে যাদের কাছে সে নথ নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে, পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসোহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্ব দস্তুরমত বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে, কিন্তু মান্য করে না।"

– রবীন্দ্রনাথের এসব বক্তব্য অংশ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নারীমুক্তির প্রশ্নটি তাঁর মনে দীর্ঘকাল থেকেই জেগেছিল। সমাজের নারীদের সমস্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত ভাবেও জড়িয়ে পড়েছিলেন আগেই তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জনসাধারণ নারীপুরুষ নির্বিশেষে যখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, পরদেশী - শাসনের হাত থেকে মুক্তি কামনা করছে তখন সেই মুক্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষার ঢেউ সংসারে নারীমনকেও বিচলিত

****

৫৯। লোকহিত (ভাদ্র, ১৩২১), কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২২৯।

৬০। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম - (ভাদ্র, ১৩২৪), কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী - ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৩৮।

করেছে, ভেতরে ভেতরে সমাজের বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ তারা মনের মধ্যে পোষণ করেছে অতি স্বাভাবিকভাবেই । তারই রূপায়ণ আছে ঘরে বাইরে উপন্যাসে । রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য — ঘরের নারীকে পরাধীন রেখে দেশের সত্যকার স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না ।

পলাতকার 'ছিন্নপত্র', 'চিরদিনের দাগা', 'কালোমেয়ে', কবিতাগুলোতে অবহেলিত নারীজীবনের চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে সমাজে কন্যার বিবাহের সমস্যার প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ । মেয়ের পাত্র জোটানোই মুশকিল, তার উপরে মেয়ে যদি কালো হয়, কুৎসিত হয়, তাহলে তো চরম বিপদ মেয়ের পিতামাতার । এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর্থিক অসঙ্গতির প্রসঙ্গও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি ।

নিরুপমাধা বালিকা শৈল পিতা, মাতা এবং কবির হৃদয়ে চিরদিনের দাগ এঁকে দিয়ে গেলো । তিনটি মেয়ের পরে বাপের ঘরে শৈল জন্মালো একেবারেই অবাঞ্ছিত হ'য়ে । এটাও কু সংস্কার । এ ছাড়া ছেলে আর মেয়েতে যে তফাৎ তা ছিল সে যুগে আরো প্রবল । আর্থিক সমস্যা বড়ো সমস্যা সর্বকালের । পুত্র যে আর্থিক নির্ভরতা দিতে পারে কন্যা তা পারে না । কন্যার বিবাহসমস্যা পিতামাতার মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে । বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মেয়েরা তখনও আধুনিক শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ করেনি । কাজেই তাদের সামনে প্রতি পদেই বিধিনিষেধ আরোপিত হ'য়েছে । ঘরের মধ্যে, নির্দিষ্ট গণ্ডীটুকুর মধ্যে তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ আর ঘর - গৃহস্থালির কাজটুকুই তাদের দ্বারা চলত বেশ । 'চিরদিনের দাগা' কবিতায় —

বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষি
নামল যেন শিলাবৃষ্টি রাশি । —

— এই উপমাটির সাহায্যে কবি শৈলর অবাঞ্ছিত আগমনকে

সুস্পষ্ট করে এঁকে তুলেছেন । 'পোড়ামুখী', 'হতভাগী', 'সর্বনাশী' এই শব্দগুলো শৈলর আবির্ভাব মাত্রেই যে অমঙ্গল সূচনা তাকেই চিহ্নিত করেছে । ভাঙা নেয়ে যে খেয়াতরীতে পারাপার করায় তা আরো স্পষ্ট প্রতীকী রূপের মধ্য দিয়ে আভাসিত হ'য়েছে বর্মার পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ও রেঙ্গুন যাবার পথে ইরাবতীর সাগর মোহনায় জাহাজ ডুবিতে শৈল - র চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পরাধীন বাংলায় চাকরির সুযোগ সুবিধে করতে না পারায় বাঙালি ছেলেরা অনেকেই বর্মামুলুকে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যেতো । এ বিষয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত স্বয়ং শরৎচন্দ্র । কাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে পিতাকে বর্মা থেকেও পাত্রের সন্ধান করতে হ'য়েছে । এক কালো মেয়ে , তার —

বছর বছর করে জমে
    বয়স উঠছে জমে ।
বর জোটেনা, চিন্তিত তার বাপ ,
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
    দিবসরাত্রি কালো মেয়েটিরে ।

নারীর দুঃখ ও বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ 'পলাতকার' 'মুক্তি' 'ফাঁকি', 'মায়ের সম্মান' , 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতাতেও দেখা দিয়েছে । যেমনি স্বামী পরিবারে নানাভাবে উপেক্ষিতা নারীর অসহায় যন্ত্রণা 'মুক্তি' ও 'ফাঁকি' কবিতাতে লক্ষ্য করা যায় । সংসারে দশের ইচ্ছা বোঝাই করা, পদে পদে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন নারীমন ক্লান্ত হ'য়ে মুক্তি প্রার্থনা করেছে 'মুক্তি' কবিতায় । ন'বছর বয়সে স্বামীগৃহে এসে তারপর দীর্ঘ বাইশ বছর ঘর গৃহস্থালী করে সমাজ, সংসারের নানাবিধ কু সংস্কার আর খেয়ালের শিকার হয়ে মুখ বুঁজে থাকায় নারীর মন ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অনন্যোপায় হয়ে দুঃসহ আত্মনির্যাতনেও সে নিজেকে করেছে

বিড়ম্বিত । দীর্ঘকালের চাপা উষ্মা অসুস্থতার উপলক্ষে সহজেই ধরা পড়েছে কবিতাটির সূচনাতেই —

ডাক্তারের যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিয়রের ওই জানলা দুটো, গায়ে লাগুক হাওয়া

এরপর থেকে দীর্ঘ আলাপে অতীত দিনগুলোর অস্বস্তিকর ও অনভিপ্রেত সংসার যাত্রার কথা উচ্চারিত । জীবনকে তার তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতেও রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আগ্রহী তাই শেষ পর্যন্ত জীবনমরণ যেখানে একসঙ্গে মিলে গেছে সেই অকূল বিরাট মোহনার অঙ্গনে —

'আঁতুর - ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো' — মিলিয়ে

যায় । আঁতুর ঘরের সঙ্গে নারীর নিকট সম্পর্কের কথাও এতে ধরা পড়েছে আর ফেনার সঙ্গে আঁতুর ঘরের উপমিত রূপটিও তাই চমৎকার । 'মুক্তি'র নায়িকা দীর্ঘ রোগভোগের মধ্য দিয়ে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে তাতে তার একরকম বিদ্রোহিনী মূর্তিই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে । তার এই উপলব্ধি তাকে পৌঁছে দিয়েছে নারীজীবনের মহিমা আশ্রয়ে ।

জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ - পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে —
আমি নারী, আমি মহীয়সী ,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল - ফোটা ।

মাতা, পত্নী, প্রেয়সী নয় – এই নারী সার্থক হ'য়ে উঠেছে শুধু তার নারীর মহিমাতেই ।

'পলাতকার' 'ফাঁকি' কবিতাটিতেও অসুস্থতার এই সুযোগেই বিনু চাপলো প্রথম রেলের গাড়ি , এবং বিয়ের পরে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি ছাড়লো। দেখা যাচ্ছে শারীরিক অসুস্থতাই নারীর সংসারের জাঁতাকল থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পথে এক কুলিবধূ রুক্মিনীর দুঃখের বৃত্তান্ত, তার আর্থিক প্রয়োজন, তার কন্যার বিবাহ - সমস্যা বিনুকে আকর্ষণ করে । তাকে সে আর্থিক সাহায্যও করে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী , এক নারী অন্য নারীর দুঃখে কাতর হয় । কন্যার বিবাহ - সমস্যা কুলি রমনীর যেমন আছে । এ সমস্যায় বিনুও ভাবিত । তাই স্বামীর কাছে বিনুর আবদার । কেননা –

> কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
> পৈঁইচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই,
> অনেক টেনেটুনে তবু পাঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি ,
> সে ভাবনাটা ভারি
> রুক্মিনীরে করেছে বিব্রত ।

আর এই কুলি দম্পতির দুঃখের ইতিহাসে মিশে আছে 'তেরোশ কোন সালে'র বাংলা দেশের আকাল, অজন্মা, উৎকণ্ঠ জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী । ফাঁকি কবিতায় বিনুর জীবনে মুক্তি-র স্বাদ এসে পৌঁছেছিলো অসুখের জানালা দিয়ে । সন্তানের জন্ম দিয়ে পিতা যখন মোক্ষ লাভের মোহে স্ত্রীর ওপরে সন্তানের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পলাতক হন সেই স্বামীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রায়শ্চিত্ত স্ত্রীকে কীভাবে করতে হয় , লাঞ্ছনা ও অসম্মানের কোন অতলে নারীকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় – তার করুণ ও নিঁখুত ছবি ফুটে উঠেছে 'মায়ের সম্মান' কবিতায় ।

অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে যেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে ।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
ঢুবে একেবারে ।
পাছে কারো চোখে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা বলে ওঠে , "আপদ জুটল কোথা থেকে, " —
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম ।

কৌলিন্য প্রথার প্রকোপে কন্যার সঙ্গে পাত্রের যতোই অসামঞ্জস্য থাকুক পিতার কাছে কুলীন পাত্রেরই আদর বেশী । সংসারে, সমাজে নারীর অধিকার পুরুষের চেয়ে অনেকাংশে খর্বিত বলেই এক্ষেত্রে কন্যার মাতার মতামতের প্রশ্নই ওঠে না — কন্যার তো নয়ই । মনে মনে তাই ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে 'নিষ্কৃতি' কবিতায় মায়ের মন কন্যার মন । —

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা ।
তার মাতৃস্নেহাসক্ত মন বিদ্রোহ করে উঠলো ,—
'এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো' । — কিন্তু পিতারও
স্পষ্ট জবাব — "জান না কি মস্ত কুলীন ও যে ।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব ।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব ।"

পিতার কথাই রইলো । মঞ্জুলিকার বিয়ে হ'লো বয়সে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বড়ো

কুলীন পাত্রের সঙ্গেই । কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সিঁদুর মুছে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হ'লো মঞ্জুলিকাকে । অনুরূপ ঘটনা বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথার গৌরবে অনেকবারই ঘটেছে বাংলাদেশে । তবে সহমরণ প্রথা তখন আর বলবৎ ছিল না — এইটেই যা রক্ষে । ভরা যৌবনেই মঞ্জুলিকা আদিষ্ট হ'লো কঠিন বৈধব্যব্রত পালনে । ইংরেজী প্রেমের উপন্যাসের রসাসিক্ত পিতার মন কিন্তু আপন কন্যাটির বৈধব্যের কঠোর সংযম পালন সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন । তাই কন্যাগত - প্রাণা মাতার স্নেহ আবদারকেও উপেক্ষা করে কন্যার পিতা বলেন — "তোমরা মায়ে ঝিয়ে/এক লগ্নেই বিয়ে করো আমার মরার পরে;/সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে ।" মাতার মৃত্যুপর পর পিতৃগৃহের সমস্ত দায়দায়িত্ব বিধবা কন্যার উপরে গিয়ে পড়ে । সংযম শিক্ষা শুধু নারীর জন্যই বরাদ্দ আর নারীও সেই আবহমান সংস্কারের কাছে নিজেকে ধরা দেয় । অন্যদিকে মনু থেকে মহাভারত অবধি সমস্ত শাস্ত্রের সমর্থন নিয়ে পুরুষের বহুবিবাহে বাধা থাকে না । কিন্তু কালের নিয়মে একদিন পরিবর্তন আসে — নির্যাতিতা নারীমনও বিদ্রোহী হয় — বিধবা নারীও নিজের ইচ্ছে মতো আবার বিবাহ করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে । কুসংস্কারাচ্ছন্ন কঠিন পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পৌরাণিক উপমার মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে । শাস্ত্রীয় সংযম, কঠিন মনের জোর মঞ্জুলিকার পিতার মধ্যে আছে;— জমদগ্নি ও অষ্টাবক্র ঋষির এহেন মনোভাবের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে । পৌরাণিক কাহিনী আমাদের জীবনে অনেকটা আদর্শ হ'য়ে মোহের সৃষ্টি করে থাকে আর এ প্রসঙ্গ 'নিস্কৃতি'তে পিতার আশীর্বাদের মধ্যে কিছুটা সত্য হয়েও ওঠে —'হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি' — এর মধ্যে সাধ্বী সাবিত্রীর পতিপ্রেম ও আপন সাধনায় অটল থেকে যমের হাত থেকে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবার ঘটনাটি উত্থাপিত । জুড়ি বুঝি কিন্তু কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'লেও বাস্তবে কোনো কালেই সাধ্বী স্ত্রীরা যমের হাত থেকে স্বামীদের ফিরিয়ে আনতে পারে না সাবিত্রীর মতো । কিন্তু তারা যা পারে তা হ'লো — জীবনকে উপবাসের

হাত থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে । আর ধীরে ধীরে এই ভাবনাই বিংশ শতাব্দীর নতুন সমাজ সচেতন পৃথিবীর চঞ্চলতার মধ্যে নারীর চেতনায় সঞ্চারিত হ'য়েছে এবং তার মুখে ভাষা জুগিয়েছে । বিশ্বের চলার তালে তালে নারীর জীবন-ভাবনাতেও পরিবর্তন এসেছে । এর জন্য নারীরা সক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন — ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকেননি । নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে, সভাসমিতি করে, সংগঠিত করে তুলেছেন নিজেদের। দাবী তুলেছেন — স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের , শিক্ষায় পুরুষের সঙ্গে সমান সুযোগের, পুরুষের সঙ্গে সমান ভোটাধিকারের এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের , একই প্রকার কাজের জন্য পুরুষের সমান পারিশ্রমিকের, নারীর বিয়ের বয়সকে বিলম্বিত করার । ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে Women's Conference-এ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় —

The Women's conference had its annual session in Madras on the 28th December last with Mrs. Srinivasa Aiyangar in the chair. The following resolutions were passed -

(i) That this conference calls for the application of compulsory primary education to girls at the same time and to the same degree as to the boys.

(ii) That this conference affirms the necessity for the establishment of more medical colleges for women and for more hostels for nurses in training.

(iii) That this conference considers that religious instructions, physical culture, and class singing should be

made compulsory subjects in all schools, and that, in addition, domestic science should be made a compulsory subject in all girls' schools.

(iv) That this conference calls on the Government of India and on all the Legislative Councils to remove from otherwise qualified women the disqualification of sex from all public franchises and from eligibility for nomination or election to any public Board or Council.

(v) That this conference believes that women doing the same work as men should get the same wages, and it also asks that women government Inspectresses should be appointed to supervise the conditions of working women.

(vi) That this conference calls on the Government to pass Laws prohibiting the manufacture and sale of alcoholic drinks in India.

(vii) That this conference considers it advisable for girls to be married as late as possible.

(viii) That this conference emphatically desires that schemes of infant and child welfare should be organised and developed throughout all parts of India and that they should be enthusiastically supported by women.

(ix) That this conference calls for the improvement of the condition of our sisters in the Fiji Islands, to whom our sympathy is hereby sent.

(x) That this conference recommends the formation of Women's Associations in every town". ৬১

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন চলছে দেশে । নারীরাও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন – স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দেশের লোককে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন । ' Women Civil Resisters ' এই শিরোনামে Modern Review পত্রিকায় তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় । —

" Srimati Basanti Devi (Mrs. C. R. Das); Srimati Urmila Devi (Mrs. Ananta Narayan Sen), and Srimati Suniti Devi, organiser of Nari Karma Mandir (Women Workers' Abode), were the first ladies in our midst to offer civil resistance to the Government proclamation by which Non-co-operation volunteering was declared unlawful. They went out into the streets asking people to buy and use home-spun cloth and to observe hartal on the day the prince of Wales was to reach Calcutta.

৬১। - The Modern Review, February, 1921, P.P 266 - 67.

Public meetings have been similarly prohibited. But such meetings are being held and attended by thousands. Hundreds of persons are being arrested. And perhaps because even improvised jails cannot provide accommodation to the crowds of Prisioners, the police have begun to use their cudgels, fists and boots freely on those attending meetings and also passers-by. But after it has been announced in the papers that those coming to the meetings must come prepared to be assaulted, the attendance at them has increased enormously. In Bengal, it is not customary for Hindu and Moslem ladies to appear in public. But these meetings have been addressed by ladies like Srimati Hemprabha Majumdar, Srimati Urmila Devi and others, including a Musulman lady. People have every right to do in a non-violent way that which is moral and also persuade others to do the same. They have also the right to assemble in public to discuss and to speak on public affairs, so long as they are not violent or incite others to violence. No Government is entitled to take away from peaceful people the right of free meeting and free speech.

Therefore, civil resisters, in the matters referred to in this note, are acting both constitutionally and courageously. [৬২]

এই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা নারীসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল । উল্লেখ্য যে, মিথ্যা আচার, জীর্ণ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করবার একটা বিদ্রোহী মেজাজ 'হৈমন্তী' ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্প দুটিতে ইতিপূর্বেই দেখা গেছে । 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমর মুক্তির জন্য এখানেও দেখি বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক হ'লো । নায়কের উক্তিতে জানা গেল — 'শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন ।' ডাক্তার বলিলেন , "বায়ু - পরিবর্তন আবশ্যক, নইলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে ।" গল্পের নায়ক শেষ পর্যন্ত ও তার বাবাকে বলেছিলো — "হৈমকে আমি লইয়া যাইব ।" আর তার "বাবা গর্জিয়া উঠলেন বটে রে" — নায়কের জবানীতে সমাজবিবর্তনের রূপটি ধরা পড়েছে। বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন । স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত । গেলাম না কেন ? কেন ? যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে । বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা

****

৬২। The Modern Review, February, 1922,
P.P. 249 - 50.

কে জানিত।"[৬৩] হৈমর মধ্যে যে সাহস আছে — হৈমর স্বামীর সে সাহস নেই। সে তার পিতার হাতের পুতুল মাত্র। হৈমর স্বামী পিতার আদেশ শিরোধার্য করে নিলেও 'লোকধর্ম' অপেক্ষা 'সত্যধর্ম' যে শ্রেয়তর এ সম্পর্কে সচেতন। এই চেতনা তার মধ্যে অপরাধবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছে। অপরদিকে হৈমর কথায় হৈমর আচরণে তার স্বামীগৃহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ই প্রকারান্তরে প্রকাশিত। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে নারীর বিদ্রোহ আরও উচ্চকণ্ঠ। মৃণালের সমস্ত পত্র জুড়েই আছে নারী-দের প্রতি অনাদর, অবজ্ঞা এবং একই সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহেরও ইতিহাস। এই দুটো ইতিহাসই পাশাপাশি তুলে ধরলে দেখা যায় — বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না -- তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।[৬৪] পিলে যকৃৎ এবং অম্লশূল যেমন ছিল বাংলার ঘরে ঘরে তেমনি মেয়েও অর্থাৎ কনেও ছিল ঘরে ঘরে এবং পিলে যকৃৎ অম্লশূলের মতো এরাও হ'লো যন্ত্রণা, এদেরও ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করবার জন্যই প্রতিটি ঘর যেন প্রতীক্ষায় দিন গুণেছে। বাংলাদেশে পাত্রেরও তো অভাব নেই — যে কোনো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে — অষ্টের মড়া হলেও ক্ষতি নেই, কোনো ক্রমে কন্যার আইবুড়ো নামটা একবার ঘুচিয়ে দেওয়া চাই। আর মেয়ে মানুষ যতই দুঃখ যন্ত্রণা পাক কিছুতেই সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে যে পারে না। অন্তত এই রকমটিই চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দী তো বটেই এমনকি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশক জুড়েও। কিন্তু আবার এই মেয়ে মানুষেরই মনের চাপা বিদ্রোহ কোথাও কোথাও বাইরে ফেটে বেরিয়ে আসে। "জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে, শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁট কাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ

* *

৬৩। হৈমন্তী, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা – ৬২৫ - ২৬

৬৪। 'স্ত্রীর পত্র', রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৬০৭

হয়ে যায় । আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারিনে । আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি তার — কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় — তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ । ... বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না । তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না । কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না । আমি বিন্দুকে দেখেছি । সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি । আর আমার দরকার নেই । " -- 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের এই বিদ্রোহিনী মূর্তি ও তার এই দৃপ্ত প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গে স্বভাবতই ইবসেন-এর এ ডল্‌স হাউস-এর নোরার কথা সহজেই মনে পড়ে । সমাজের সংসারের যে সব নিয়ম নীতি ধর্ম তার ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করেছে তার বোঝা মৃণালের কাছে অবশেষে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে । তাই তার সংকল্প স্বামীর ঘর করতে সে আর ফিরে যাবে না । নোরাও তার স্বামী হেলমারকে বলেছে — " you have prevented me from becoming a real person. " স্বামীগৃহে তার ব্যক্তিত্বের এই অস্বীকৃতি তাকে বাধ্য করেছে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে । নাটকের শেষ দৃশ্যে নোরাকেও বেরিয়ে যেতে হয় স্বামীর ঘর ছেড়ে চরম সত্যের সন্ধানে — " I want to find out which of us is right -- Society or I. " ।[৬০] এ ডল্‌স হাউস নাটক ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় । প্রকাশের পর দীর্ঘকাল ধরে নাটকখানি ইয়োরোপের নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রভাবপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে । ইয়োরোপ ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার নারীমুক্তি আন্দোলনের বিচিত্র গতিবিধি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন । স্বদেশে সমাজবিধির নিষ্পেষণে নিপীড়িত অবমানিত নারীদের

****

৬০। A Doll's House : Henrick Ibsen, Translated by Eva Le Gallienne, Act III, Scene III; Modern Library College Edition.

মুক্তিকামনায় তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'য়েছে। পলাতকার কবিতায় অবহেলিত নারীত্বের অসম্মান লাঞ্ছনার মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডিকে এঁকে তুলেছেন। আর যেহেতু নারীকেই তার আপন অধিকার অর্জন করে নিতে হবে প্রচলিত বিধিবিধানের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলে তাই তলে তলে তাঁর বিদ্রোহিনী মূর্তিরও আভাস দিয়ে গেছেন।

'পলাতকা'র পর রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনায় সাময়িক বিরতি লক্ষ করা যায়। ১৩২৮ এর পর থেকে আবার কবিতার পালা শুরু হয় — লেখা হ'লো শিশুজীবন - রহস্যের লীলা মাধুর্যময় 'শিশুভোলানাথে'র কবিতা আর তার-পরে ১৩২৯ সালে নতুন ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করেন 'লিপিকা'র কাব্যকথিকাগুলি। লিপিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'। 'পূরবীতে' কবির নিরাসক্ত মনের উদাস শান্তি ও মাধুর্যভাবনাময় বেদনা পুঞ্জিত হ'লো অতীত দুঃখ সুখের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পেরুযাত্রার পথে রওনা হলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছলেন ৭ই নভেম্বর। আর্জেন্টাইনের প্রধান বন্দর নগরী বুয়েনোস এয়ারিস কবিকে দুই মাস আতিথ্যদানে খুশী করলো। এই সময়েই সেখানে অসুস্থ কবির সেবাযত্নের দায়িত্ব নিয়ে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুললেন এক নারী, নাম ভিক্টোরিয়া ও-কাম্পো। 'পূরবী'র অন্তর্গত অনেক কবিতাই এই পর্বে রচিত। কাব্যগ্রন্থটি 'বিজয়া'কে (ভিক্টোরিয়া ও কাম্পোকে) উৎসর্গিত।[৬৬] কিন্তু 'পূরবী'র নারীপ্রেরণা মূলক সমস্ত কবিতার আবেগ কেন্দ্রে ভিক্টোরিয়ার অনন্য অবস্থান কল্পনা করাও অসমীচীন। কবি আছেন বিদেশের পথে, — মনে তাঁর

****

৬৬। " My readers who will understand these poems will never know who my Vijaya is, with whom they are associated".

-ভিক্টোরিয়াকে পূরবী গ্রন্থ উপহার প্রদান উপলক্ষে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ উদ্ধার করে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন — "সাধারণভাবে কবিতাগুলির আস্বাদনে মনে রাখা ভালো এই সান্নিধ্যের কথা, কিন্তু তাহলেও এমন রচনাকে একেবারে আক্ষরিকভাবে ভিক্টোরিয়া ও কাম্পোর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ঠিক নয়, কবিতাগুলির প্রতি সেটা সুবিচার হবে না।"

— ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ : শঙ্খ ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ১১১।

চলার নেশা , — পথ চলার আনন্দ আর মনের গভীরে আছে জীবন গোধূলিতে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া একান্ত ভালোলাগা আনন্দ ও সৌন্দর্যস্মৃতি । জীবনের ষাটটি বছর পার করেছেন কবি এই সময় এবং এই সময়ের লেখা 'পূরবীর' কবিতাগুলোতে অতীত জীবনের প্রেম, মাধুর্য, নারীর প্রীতিস্পর্শ আর তার সঙ্গে বন্ধনমুক্ত যৌবনোচ্ছল দিনগুলোর আনন্দ বেদনার রঙ লেগেছে । যেন প্রৌঢ় মধুর যৌবনে পদার্পণ । 'পূরবী' কাব্যের পটভূমিকা রচিত হয়েছে কবির পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারীতে । 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতায় ছবি দেখে প্রিয়জনের স্মৃতিতর্পণের মধ্য দিয়ে প্রেমের যে আবেগ জেগে উঠেছিলো তা বলাকার পরবর্তী কাব্যকবিতাতেও দেখা গেল । 'পূরবী'র কবিতায় সেই নারীপ্রেমের, প্রিয়তমা লীলা-সঙ্গিনীর মোহাঞ্জন কবিকে ব্যাকুল করেছে । 'মহুয়া'তে পৌঁছে সেই নারীপ্রেমেরই বিচিত্র বর্ণিল সাধনবেশের কথা কবি বলেছেন । বিচিত্রবেশে যে নারী আবির্ভূত তাকেই কবি ডাক দিলেন 'পূরবী'তে 'আহ্বান' কবিতায় —

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া ।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া ।
দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে ।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥ [৬৭]

* *

৬৭। 'আহ্বান' (পূরবী),
(হারুনা - মারু জাহাজ ১ অক্টোবর ১৯২৪)।

এই কবিতা রচনার চারদিনের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন — "আর কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনে কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটলো। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়, তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউবা ঘরের কোণে, কেউবা পথের বাঁকে। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোয়, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের।"—[৬৬] এই ভাবনাই রয়েছে 'পূরবী'র লীলাসঙ্গিনীরও প্রেরণামূলে। একদিন পরে দিনে রচিত 'পূরবী'র ক্ষণিকা (৬ অকটোবর, ১৯২৪) কবিতায় একই ভাবের প্রকাশ —

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি - বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

বোঝা যায় যে দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছিলেন তার মূলে আছে এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। কারণ তাঁর জীবনে 'সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে' নারী এই প্রত্যয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত। বিনিময়ে নারীর প্রতি তাই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ আর ভালোবাসা।

ড: কালিদাস নাগের চিঠিতে জানা যায় যে, যুদ্ধ যখন চলছে তারই মধ্যে রোলাঁ ও তাঁর সহকর্মীরা একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন,

৬৬। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ৫ অকটোবর, ১৯২৪, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৫৬১।

তার মধ্যে বিশেষভাবে বিভিন্ন দেশের নারী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হ'লো নূতন ভাবে সমাজের উদ্বোধন করবার জন্য তার এর নাম দেওয়া হ'লো 'দি ইন্টারন্যাশনাল লীগ অভ ওমেন ফর পিস্ এ্যান্ড লিবার্টি ।' কালিদাস নাগের এই চিঠির মাধ্যমে এবং রোঁলাঁর কাছ থেকেও জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথ নূতন সমাজের উদ্বোধন করবার আশায় দেশে দেশে নারীশক্তিকে আহ্বান জানান হচ্ছে । দেখা গেলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে পৃথিবী জুড়েই নতুন সমাজের উদ্বোধন করবার আশায় নারীশক্তিকে প্রয়োজন হয়েছে বিশেষভাবে ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে সমাজ যখন নূতন প্রগতির পথে পা বাড়াচ্ছে সেই সমাজের সামনে তখন দ্বিবিধ সমস্যা — ভাবনা । সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নারী জাগরণ। নারীর স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন জাগে । নারীরাও সক্রিয়ভাবে তাদের বিভিন্ন সভায় সমিতিতে নারীর অধিকারের প্রশ্নটি তুলে ধরলেন । নারীর জাগরণ ও মুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক সমর্থন ছিল । নারী সমিতির বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হলেন । ১৯২৮, ৫ই জানুয়ারী কলকাতায় 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ । ১৩৩৫, ১৫ই বৈশাখ 'সমাজ' গ্রন্থে 'নারীর মনুষ্যত্ব' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "মেয়েরা ঘরের কেন্দ্র অধিকার করে পুরুষকে সেই ঘরে বেঁধেছে । অনেকদিন ধরে অনেক উপায়ে ও উপাদানে বাঁধন হয়েছে পাকা, লোকের দৃষ্টি খুব মোটা করেই ঠেকলো । দুই পক্ষ থেকেই বন্ধনের বিনুনি গাঁথা বিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে । এমন সময় নূতন যুগ এল । আজ কথা উঠেছে বাঁধাবাঁধির পাক অত্যন্ত বেশী হয়েছে । দুই পক্ষেরই চলা - ফেরায় পদে পদে পড়েছে বাধা । . . . . . . যাই হোক মেয়ে পুরুষের সেই ভেদমূলক ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে সহজে চলে এসেছে এমন সময় একটা যুগান্তকালের ভূমিকম্প পাশ্চাত্যদেশে সমাজকে প্রচণ্ড নাড়া দিলে — সেই ধাক্কায় গণ্ডির বাইরে মেয়ে পুরুষ এসে পড়ল । ...... বর্তমান যুগের একটা প্রবল লক্ষণ এই যে চিরদিন যারা পিছনে অন্ধকারে ছিল আজ তারা সামনে এগিয়ে আসছে ।"

সমাজে নারীর মধ্যেকার কল্যাণশ্রীর উদ্বোধন ও নারীর পূর্ণ মর্যাদার বিকাশ রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই প্রার্থনা করেছেন । এতকাল নারী যে তার স্থিতি নিয়ে এবং ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে তার আপন হৃদয়ের রঙে রসে রাঙিয়ে নিয়ে – আপন বুকের কাঁচুলি আর আপনার মুখের ঘোমটা তৈরি করেছে, এই ঢাকাতেই যে আপনার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছে । কিন্তু এও যেমন দেখেছেন, হঠাৎ আবার যুদ্ধোত্তর যুগে পাশ্চাত্ত্য সমাজে নারীরা জেগে উঠেছে পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে তার সঙ্গে সমান তালে, সমান চালে পা ফেলে রাস্তায় চলবার দাবি তুলেছে তাকেও গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ । এই নারীর প্রেম ও তার সঙ্গে পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ বললেন —

"নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই । পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায় , নারীর প্রেমে আপনার্থ সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো , এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে, মদন ধনুর জ্যায়ের টঙ্কার – সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সঙ্গীত । তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয় । কেন বলি, পুরুষের ধর্ম তপস্যা । কারণ, জীবলোকের কাছে প্রকৃতি তাকে নারীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েছে । সেই অবকাশটাকেই নষ্ট করলেই তার সবচেয়ে ফাঁকি । মুক্ত আকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তিসাধনার যে মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাবার ভার পেল । সে কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয় , তা হলে মর্ত্যের মর্মস্থানে যে অমরাবতী আছে তার পরাভব ঘটে , পুরুষ যায় প্রমত্তার রসাতলে , আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে

তা থেকেও পিয়ে যে রস ধুলাকে পঙ্কিল করে ।" [৬৯]

কবির এই ভাবনায় নারী পুরুষ দুয়েরই পারস্পরিক প্রেম ও কর্তব্যবোধের প্রশ্ন জড়িত । তৎকালীন সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই কবির মনে এ প্রসঙ্গ এসেছে যা তাঁর উক্ত গদ্যরচনায় সমধিক গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত । কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে — কী ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে — কোথাও নারীরা পিছিয়ে থাকতে চায় না । তারা ঘর ও বাইরের কর্তব্যভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে উন্মুখ আর তাই সমাজের স্বদেশের সমস্ত ভাবনার সঙ্গে নিজেদেরকেও যুক্ত করেছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'মহুয়া'র কবিতায় নারীর শক্তিমত্তার পরিচয় ধরা পড়েছে — প্রেমের মাধুর্য-ময়তার সঙ্গে বীর্যচিত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে । বিবাহের উপহার সামগ্রীরূপে 'মহুয়া'র কবিতার সূত্রপাত ঘটলেও শেষ পর্যন্ত আন্তরিক আবেগেই আরো কবিতা লেখা হোলো 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের । 'বলাকা'র কবিতায় নারীর সামাজিক মুক্তির প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল আর 'মহুয়া'র কবিতায় নারীভাবনার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে নারীর অন্তরের শক্তি সামর্থ্য ও তার হৃদয়ের মুক্তির কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ । 'মহুয়া' কবিতা সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন —

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই । একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা । তাতে প্রণয়ের প্রসাধন কলা মুখ্য । আর একটিতে আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন বেগই প্রবল ।" [৭০]

প্রণয়ের সাধনবেগ যেখানে প্রবল নারীরা সেখানে পুরুষের উপর নির্ভর করেনি, তাদের বলিষ্ঠ প্রেমে কাতর প্রার্থনা নেই । বলিষ্ঠ মানসিকতায় এই নারীরা জাগ্রত ।

* *

৬৯। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, আণ্ডেস জাহাজ , ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ ।

৭০। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'পাঠপরিচয়ে' উদ্ধৃত কবির পত্র ।

'মহুয়া'র 'স্পর্ধা' কবিতাটিতে শোনা যায় —

জীর্ণ মজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি শ্রদ্ধা করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে —
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে - যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।' [৭১] —

আর তাই নারী প্রেমের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই কবি বলেন —

তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।' [৭২]

প্রজ্জ্বলিত বর্ণবহ্নির অজস্র ঐশ্বর্যভার নিয়ে সমস্ত বন জুড়ে পলাশ শিমূলের যে মাতামাতি তাতে যেন মনে হয় শুধু ধরাতল নয়, ধরাতলে এবং আকাশেও তারা — 'আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত ফেণ - সুরা।' [৭৩] এই শুভযোগ নারীর অজস্র ঐশ্বর্য ভারবনত প্রেমেও লক্ষণীয়। এই পলাশ শিমূলের রক্তবহ্নি আর রক্তফেণা সুরার মাদকতায় যৌবনের অদম্য উৎসাহ, প্রেমের রক্তরাগ প্রস্ফুটিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে এমন সময় এলো যখন নারীরাও তাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে অনেকটাই সচেতন হয়ে উঠেছে, তাদের প্রেমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠে বলেছে —

'অগোর পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।'

****

৭১। স্পর্ধা (মহুয়া), (জোড়াসাঁকো ৩০ আগষ্ট, ১৯২৮), রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

৭২। প্রতীক্ষা, মহুয়া (১৭ আগষ্ট, ১৯২৮) রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

৭৩। শুভযোগ, মহুয়া (২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫) রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ।

আবার —

'উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ - মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে ।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব ,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব ।' ৭৪

'মহুয়া'র 'সবলা' কবিতাটিতে দেখা যায় নারীর কণ্ঠে স্পষ্ট জেগে উঠেছে রুদ্রবীণা । আপনার দৃপ্ত তেজে যেন আপন অধিকারের দাবিকে বাস্তবায়িত করে তোলে — নারীর এমন একটা প্রার্থনা বিধাতার কাছে কবিতাটির শেষাংশে মূর্ত হয়ে ওঠে । কবিতাটির শুরু থেকে প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই শোনা যায় এতকালের ভাগ্যবঞ্চিতা, সমাজে অবহেলিতা নারীর মুখে স্পষ্ট প্রতিকারের দাবি — বিধাতার কাছে তার সরাসরি প্রশ্ন ,—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ।

দুর্গমের দুর্গ থেকে সাধনার ধন আহরণ করবার শক্তি নারীর আছে । তবুও সে কেন ভাগ্যবঞ্চিতা হয়ে থাকবে এ প্রশ্ন জেগেছে নারীর মনে —

৭৪। নির্ভয়, মহুয়া, (৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৫), রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ । (সবলা)

বিংশ শতাব্দীর এই নারী ভয় পায় না দুর্গমকে , দুরধিগম্য অনিশ্চয়তাকে । বধূ-বেশে শুধু কিঙ্কিনী বাজিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ নয় -- প্রেমের পরিপূর্ণ মর্যাদায় সে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । তাই বরমাল্য সে একদিন বীর হস্তে তুলে দেবেই। কেননা নারী চায় —

কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা ।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার, --
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার [৭৫]

পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর যোগ্য সম্মান নারী যে এতকাল পায়নি কিন্তু আজ আর সে অবহেলিত হয়ে থাকবে না কিছুতেই । এমন স্পষ্ট বক্তব্য 'মহুয়া'র কবিতায় বিশেষ করে 'সবলা'য় কবি তুলে ধরেছেন । রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের চিঠিপত্রে, গদ্যরচনায়ও এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য যে অনেকটাই নারীর বীর্যবান -- প্রেম ও আত্মশক্তির উদ্বোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছে তা আগেই আলোচিত হয়েছে । 'মহুয়া'র পরিচয় কবিতাটিতেও কবি নারীর সেই দৃঢ় জাগ্রত কঠোর সাধনালব্ধ প্রেমকেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন —

****

৭৫। সবলা, (মহুয়া, (২৩ আগস্ট, ১৯২৮) , রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ।

— সহজ - সাধন লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন ।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে - সম্মান
তাই তব দান । [৭৬]

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের সূচনা অংশে সংযোজিত 'উজ্জীবন' কবিতাটির বক্তব্যই 'মহুয়া'র ভাবে ভাষায় প্রকাশিত । —

উদ্ভাসিয়া তুঙ্গ লক্ষ্য এস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস ।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু । —

এই ভাবই চলেছে বিশেষভাবে নির্ভয়, সবলা, প্রতীক্ষা প্রভৃতি কবিতায় । বিদায়, পথের বাঁধন, শেষের কবিতা প্রভৃতি রচনা প্রেমের সহজ সুখ ও মাধুর্য এক ধরনের বিশিষ্টতা পেয়েছে এবং মহুয়ার অন্যান্য কবিতার ভাব প্রসঙ্গের মধ্যেও এগুলোর আত্মীয়তা আছে ।

যা শিথিল তা ঝরে যাক, দুর্বলতা নয় কঠিন দৃঢ় বলিষ্ঠতা, তাকে প্রকৃতির আবির্ভাবেও কবি লক্ষ্য করেছেন । যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছলতা যা পলাশ শিমূলের রক্তিমবর্ণে আকাশে বাতাসে রুদ্র ঝংকার জাগিয়ে তোলে তাকেই কবি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং 'মহুয়া'র প্রেমের পাত্রে ভরে পরিবেশন করেছেন ।

****

৭৬। 'পরিচয়', মহুয়া, (২০ আগস্ট, ১৯২৮) রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ।

'বিচিত্রা'র কবিতাতেও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ এসেছে । নারীর স্বাধীনতা ও তার আত্মশক্তির জাগরণ সম্পর্কিত কবির এই সময়ের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৩৮ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে । হেমন্তবালা দেবীর মধ্যে চিত্তের যে সচলতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন তা সাধারণ স্ত্রীলোক সুলভ নয় এবং তাই নারীসুলভের রীতি নিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধছে বলে কবির বিশ্বাস । হেমন্তবালা দেবীকে ২৩শে আশ্বিন কবি একটি চিঠিতে লিখলেন —

'সমাজ নিয়ে ভাঙাগড়া করবার সখ আমার একটুকুও নেই, তবে এটা জানিয়ে এই অচল জড় সমাজ গলায় বেঁধে আমরা দুর্গতির তলায় নেবেছি । বিদেশী শত্রুকে ভয় করিনে কিন্তু এই সাংঘাতিক সমাজকে ভয় করি, যাদের বীজ বীজ পুঁতে রেখেছে আমাদের মজ্জায় '৭৭

এই ভয়ঙ্কর সমাজব্যবস্থায় আছে নানাবিধ কুসংস্কার, অস্পৃশ্যা-আন্দোলন, নারীপুরুষের সম্পর্কে নানা বৈষম্য । নারীই এই সমাজের কুসংস্কারের একটি প্রধান শিকার হয়েছিল এতকাল । নারীর শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবীকেই ১৭ অগ্রহায়ণে লেখা চিঠিতে আবার লিখলেন —

"মেয়েরা অজস্র স্নেহ প্রেম ভক্তি দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সংস্কারকে পূর্ণ করে তুলবে এইটেই চাই, এইটে হোলো তার রসের দিক, — এর সঙ্গে তার শক্তির দিক আছে যে দিকে তার নিষ্ঠা, ধৈর্য, ত্যাগের দৃঢ়তা, যে -শক্তির দ্বারা সে আপন আশ্রয়কেও আশ্রয় দেয়, পালন করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে, তার বিকারকে শোধন করে তার বেদনার আরোগ্য আনে, অর্থাৎ যাতে করে সে নির্ভরের দ্বারা দুর্বল করে না, চরিতার্থ করে ।"

* *

৭৭। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, শান্তিনিকেতন, ১০ অক্টোবর ১৯৩১ (২৩ আশ্বিন, ১৩৩৮) চিঠিপত্র — দ্বিতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

— আর এই প্রসঙ্গেই কবি পুরুষের পৌরুষও প্রার্থনা করেছেন যা দেশে, সমাজে, সংসারে স্বাস্থ্য, শান্তি, সম্পদ, আত্মসম্মান ও মুক্তি বজায় রাখতে পারে। 'বিচিত্রিতা'র কয়েকটি কবিতায় কবির উক্ত ভাবনারই পরিচয় প্রকাশিত। যেমন 'কুমার' কবিতাটিতে —

"কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।

* * *

যেরো জাগে সে যে রাতের প্রহর গনি,
তোমার বিজয়শঙ্খ উঠুক ধ্বনি।
গর্জিত তব তর্জন ধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে,
খণ্ডিত হোক বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির আখরণী।" ৭৮

আবার —
'প্রকাশিতায়' —

"আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া
আগাগোড়া,
জড়োসড়ো ঘোমটায় - ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা।
আসিবে - যে আর - একদিন
নারীর প্রাণিয়া নিয়ে হবে তুমি অন্তরে স্বাধীন

****

৭৮। 'কুমার' (বিচিত্রিতা) ১২ মাঘ ১৩৩৮। রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১১৭ - ১৮

বাহিরে যেমনি থাক্ ।
আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে শুধু তব জয়ধ্বনি ।
তিনি নহে তোমার সংসার হে রমণী ,
সেবার গৌরব ।"

একদিকে পুরুষের জন্যে নারীর প্রতীক্ষা , স্বামীপুত্র ও আরো পাঁচজন নিয়ে তার ঘর সংসারের দিনযাত্রা, অন্যদিকে তার অন্তরে মুক্তিমন্ত্র — সে মুক্তিমন্ত্র সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, নারীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে আবার দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধেও উচ্চারিত । এই মুক্তির বাণী কিভাবে এই সময়ে ফলপ্রসূ হতে চলেছে সমকালীন পত্র পত্রিকায় তার অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে । The Fourth All-India Women's Conference — এর প্রস্তাবে নারী সমাজের দাবীগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —

" Five out of the eight resolutions were proposed by the chair (Mrs. Sarojini Naidu) - dealing with unequal marriages, with the need for at least one women magistrate to be present at each sitting of Juvenile Courts and the establishment of these courts in all provinces, a resolution that marriage should not be compulsory for girls, giving the support of the conference to the further amending of the special Marriage Act of 1872 and desiring the inclusion of women representatives well-acquainted with Indian conditions in conferences and commissions appointed to deal with questions of the National Welfare of India. The resolution on polygamy

was proposed by Mrs. Asaf Ali, supported by two other Indian ladies and was carried unanimously. Of the two resolutions dealing with labour questions the first desired the appointsent of an adequate number of Factory Inspectresses to look after the welfare and requirement of women and children employees in all Industrial areas.[৭১] সুদূর নোয়াখালির পর্দানশীন মেয়েরাও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে —

" A Large number of Purdah women volunteers picketed the gates of the civil and criminal courts. The District Magistrate, the District Judge, the Superintendent of Police and other officials stood helpless, the roads being blocked against them by the pickets. "[৮০]

বর্মী - ললনারাও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন —

" But even in provinces like Bengal, which are purdah-ridden, women have been sent to jail. In fact, in Calcutta women satyagrahis have given comparatively more work to the police to do than men. It is noteworthy that some of those who, like Mrs. Sarojini Naidu,

....

৭১। The Modern Review, March 1930, P.P - 365 - 66.

৮০। The Modern Review, June, 1930, P. - 805,

Mrs. Kamala-devi Chattopadhyaya, are leading members of the Women's social and educational reform movement, have been among the first to be sent to jail, showing that social, educational and political movements are inter-related. ৮১

নারীদের বিভিন্ন দাবী, তাদের স্বাধীনতা, তাদের সামাজিক কাজকর্ম, তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতির পথে নারীর আত্মশক্তির উদ্বোধনপ্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছে। বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে যে সহানুভূতি, যে সমবেদনার দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের গোড়া থেকেই ছিল তা গভীরতর হয়েছে রবীন্দ্রহৃদয়ে। নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব মথিত এই পৃথিবীতে সঞ্জীবনী সুধার অন্তিম অস্তিত্ব তিনি নারীর হৃদয়ের মধ্যেই দেখতে পান এবং আশা করে থাকেন এই নারীই তার সুধার স্পর্শ দিয়ে এই মুমূর্ষ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাঁর এই প্রত্যয়ের পরিচয় দৃঢ়ভাবে ফুটে ওঠে The Manchester Guardian কাগজে প্রকাশিত রক্ত করবী নাটকের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য —

" This personality - the divine essence of the infinite in the vessel of the finite - has its last treasure-house in women's heart. Her pervading influence will some day restore the human to the desolated world of man. As in the animal world the physically meek has today inherited the earth, woman will one day prove

****

৮১। The Modern Review, July, 1930.

that the meek in soul, through the sure power of love, will rescue this world from the dominance of the unholy spirit of rapacity. The joy of this faith has inspired me to pour all my heart into pointing against the back-ground of black-shadows the nightmare of a devil's temptation - the portrait of Nandini as the bearer of the message of reality, the saviour through death" ৮২

****

৮২। The Visvabharati quaterly, October, 1925, P - 285.